উৎস মানুষ

৩১ বর্ষ • ৪র্থ সংখ্যা • অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১১

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		
বিজ্ঞানে অবগাহন	অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	২
বিস্ময়কর মোবাইল ফোন	শ্যামল ভদ্র	৮
কুসংস্কার (ছড়া)	অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৯
জলবায়ু পরিবর্তন	ক্রেইগ ইডসো/ এস ফ্রেড সিঙ্গার	১০
বন্ধু শর্মিলা	পূরবী ঘোষ	১৬
পোশাকের বিবর্তন ও ত্বকজনিত সমস্যা	শর্মিষ্ঠা দাস	১৭
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আজও কেন প্রাসঙ্গিক	মনীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার	২৩
ভেলোরের অভিজ্ঞতা	নিরঞ্জন বিশ্বাস	২৬
বনবিহারী:বিদ্রোহী, সংসারীও	সমীরকুমার ঘোষ	২৯
চিঠিপত্র/সংগঠন সংবাদ		৩০

সম্পাদক: সমীরকুমার ঘোষ

রেজিস্টার্ড অফিস - বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা-৬৪

কার্যালয়

খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন

বি ৪ ও ৫, এস-৩, নারায়ণপুর

পোঃ (আর) গোপালপুর কলকাতা-৭০০১৩৬

ফোন:৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৫৬

ওয়েবসাইট : www.utsamanush.com

ই-মেল- utsamanush1980@gmail.com

আমাদের কথা

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় আক্ষরিক অর্থেই 'উৎস মানুষ'-এর জন্য প্রাণপাত করেছেন। বিনিময়ে তাঁকে তেমন কিছুই দিতে পারি নি আমরা, ভালবাসা আর সম্মানটুকু ছাড়া। আমরা ব্যক্তিপূজায় বিশ্বাসী নই। শুধু চেষ্টা করি তাঁর পত্রিকার প্রতি দুর্বার টান, ত্যাগ, কর্মদক্ষতা থেকে উদ্বুদ্ধ হতে। তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় পত্রিকাটিকে নিয়মিত প্রকাশ করতে। গত কয়েক বছর পত্রিকাটি তিন মাস অন্তর বেরোচ্ছে। বইমেলায় যোগদান করা তো আছেই। পাশাপাশি আয়োজন করছি অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতার। এবারে ২০ নভেম্বর সেটির দিন ঠিক হয়েছে জীবনানন্দ সভাঘরে। সবাই যোগদান করলে আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াস সফল হবে।

ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাকাডেমি বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের স্বীকৃতি হিসাবে 'শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার' দেয়। এ বছর অঙ্কশাস্ত্রের সবিশেষ ব্যুৎপত্তির জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন এক সংসার-ত্যাগী সাধুপুরুষ মহান মহারাজ---রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক। একজন সাধুর অঙ্কশাস্ত্রে দখল দেখে এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে, আমরা চারপাশে গেরুয়া-পরা যে সর্বত্যাগীদের দেখতে পাই তাঁরা অঙ্কে কাঁচা। পাপিষ্ঠরা ঈশ্বরকে ছেড়ে অর্থের পিছনে দৌড়য়। তাদের অর্থ-মোহ কাটিয়ে ঈশ্বরমুখী করে তুলতে অর্জিত পাপ-অর্থ নীলকণ্ঠের মতোই আশরীর ধারণ করতে হয়। এর জন্য সাধু-মহারাজদের প্রচুর পারমার্থিক অঙ্ক করতে হয়। তাছাড়া ঈশ্বর প্রাপ্তির অঙ্ক তো আছেই। সাধুটি জাগতিক অঙ্কের ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছেন। ভাটনগর পুরস্কার কমিটির এমন সাধু উদ্‌যোগ দেখে নিশ্চয়ই এ প্রশ্ন কেউ তুলবেন না—বিজ্ঞানের সেরা পুরস্কারের দখল নিতে গেলে বিজ্ঞানমনস্ক হতেই হবে! ভাটনগর পুরস্কার দেখিয়ে দিল---অধ্যাত্মচর্চা এবং বিজ্ঞান পুরস্কারের সহাবস্থান চলতেই পারে। পুরস্কার প্রাপক মহারাজ পুরস্কার নিতে গিয়ে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের দোহাই পেড়েছেন। ধর্ম ও বিজ্ঞান এবার গলাগলি করল বলে!

আহরণ

বিজ্ঞানে অবগাহন

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

'বিজ্ঞান'কে আজ আর নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞার বন্ধনীতে পরিচিত করার উপায় নেই। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সর্বগামী ভূমিকা আধুনিক বিশ্বে অবিশ্বাস্য বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছে, নিঃশব্দে, আমাদের চেতনায়, দর্শনে, অভ্যাসে। ভেঙে যাচ্ছে সময়, ঘুচে যাচ্ছে দূরত্ব, তছনছ হয়ে যাচ্ছে দৃষ্টির সংকীর্ণ সীমারেখা। যাদবপুর বা জিয়াগঞ্জের কোনো তরুণের কাছে অনতিক্রম্য দূরত্বে থাকা মারাদোনা রোমারিও বাজ্জোর বুটে-বলের রোমাঞ্চকর জাদু কোন মায়াবী তরঙ্গ নির্ভারে ভেসে এসে শিহরিত উদ্‌বেলিত করে দিচ্ছে শরীর, তার খুপরি ঘরের ভেতর; অন্য দিকে আবার সোমালিয়ার অনাহারক্লিষ্ট কঙ্কালসার শিশুটির নিস্পন্দ চোখের কোণে হেঁটে-বেড়ানো মাছির ছবি আমরা স্পষ্ট চিনতে পারি কালাহাণ্ডিতে বা কলকাতার ডাস্টবিনের ধারে; সাত-আট কোটি বছর আগেকার টিরোনো বা ব্রন্টোসেরাস আজ ছোট্ট বালকের খেলার সাথী হয়ে গেছে—কেমন অবলীলায় বর্তমান প্রজন্ম হাতের মুঠোয় ধরে ফেলেছে প্রাগৈতিহাসিক রহস্যময় জগৎকে কমপিউটার-অ্যানিমেশনের কলাকৌশলে; অপারেশন টেবিলে এখন সার্জেনের হাতের পাতায় ধক্ ধক্ করে মানুষের হৃৎপিণ্ড, স্থাপিত হয় দেহ থেকে দেহান্তরে; টেস্ট টিউব কোন ছাড়, এখন 'স্পার্ম ব্যাঙ্ক' থেকে বিক্রি হতে চলেছে চাহিদা-মাফিক মানবশিশুর প্রাণকোষ, প্রাণসৃজনের খেলায় মাতছে মানুষ নিজেই।... কোথায় লাগে ঈশ্বর। অভ্রভেদী প্রযুক্তির প্রভুত্ব ঈশ্বরের স্বর্গীয় সাম্রাজ্যকে বিদীর্ণ করেছে ভাইকিং, ভয়েজার, হাব্‌ল কিংবা 'কোব' দিয়ে। মানুষের বাস্তব-ভাবনায়, অভিজ্ঞতায়, উপলব্ধিতে গড-আল্লা-ভগবানের জায়গা কেড়ে নিতে চাইছে বিজ্ঞান, তার প্রাযুক্তিক চমৎকারিত্বে। মানুষকে প্রতিদিন এইভাবে প্রভাবিত নিয়ন্ত্রিত করার সুবাদে বিজ্ঞান যেন উচ্চলোকের পরমশক্তিমান নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় চিহ্নিত হচ্ছে আমাদের কাছে।

বিজ্ঞানের এই দূরত্বে অবস্থিত চরিত্রটিই কমবেশি পরিচিত সাধারণের কাছে। বিজ্ঞানীদের অবস্থান যেন সমাজের সাধারণ স্তরে নয়, বিজ্ঞানের জগৎ যেন সকলের বিচরণের জন্য নয়, যেন আমাদের দৈনন্দিন জ্ঞানবুদ্ধির বাইরেকার কোনো সমীহ আদায়কারী বিশেষজ্ঞের বিষয় এই বিজ্ঞান। একজন ছা-পোষা করণিক থেকে অলংকৃত বিজ্ঞানী নিজে পর্যন্ত এরকম একটা ধারণাই মোটামুটি পোষণ করেন।

অথচ বিজ্ঞান সম্পর্কে এই জনপ্রিয় ধারণাটিই অবৈজ্ঞানিক। প্রকৃতপক্ষে, বিজ্ঞান সর্বত্র সর্বকালে সকলের মধ্যে একইভাবে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে, কেবল দেখা বোঝা আর ধরার ফারাক।

By science we understand a body of rules and conception, based on experience and derived from it by logical inference, embodied in a fixed form of tradition and carried on by some sort of social organisation.

Encyclopaedia Britannica

ইউক্লিড আর্যভট বা গ্যালিলিও, পাস্তুর ডারউইন বা আইনস্টাইন যেভাবে বিজ্ঞানকে দেখেছেন, ধরেছেন, তত্ত্বের আধারে সূত্রবদ্ধ করেছেন, সেভাবে আজকের কোনো মার্গারেট, মুখুজ্যে-মশাই বা করিম মিঞা বিজ্ঞানকে আদৌ সেভাবে দেখেনি বটে, জানেনি বিজ্ঞানের সঠিক রূপ—কিন্তু অতি বড় সত্য হল বিজ্ঞান এদের সকলেরই ধরাছোঁয়া ওঠাবসার মধ্যেই আছে ভীষণভাবে। কথাটা হয়তো হেঁয়ালির মতো শোনায়, কিন্তু দেখুন—মার্গারেট তার কটকটে ফরসা গায়ের চামড়া বাদামি করে তোলার জন্য যখন সি বিচ-এ টানটান শুয়ে রোদ লাগায়, তখন সে জানে না সে বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করছে; মুখুজ্যেমশাই কচুবাটার ভক্ত, মাঝেমধ্যে গলা চুলকোলে তেঁতুল বা টক খেয়ে যখন তিনি গলার চুলকুনি কমান তখন তিনি না জেনেই বিজ্ঞান প্রয়োগ করেন; করিম মিঞা তার চাষের ক্ষেতে ফসল বোনার আগে ধনচে ঘাস গজাতে দেয় প্রত্যেকবার নিয়ম করে, এই ঘেসো আগাছায় মাটির জান বাড়ে করিম জানে, কিন্তু জানে না যে বিজ্ঞানের চমৎকার প্রয়োগ সে করছে এইভাবে।... অর্থাৎ বিজ্ঞান রয়ে গেছে হাটে মাঠে অন্দরে অন্তরে কিন্তু এর তত্ত্বগত ভিত্তি, পদ্ধতি ও সাধারণীকৃত (generalised) স্বরূপটি জানা-বোঝার আওতায় নেই বলে ব্যাপক মানুষের বিশ্বাসে, মননে, আচরণে বিজ্ঞানের প্রয়োগ যথাযথ হয়ে উঠতে পারে না।

বিজ্ঞানের স্বরূপ নিহিত রয়েছে প্রকৃতির দুনিয়ায় সুনির্দিষ্ট নিয়ম নির্ধারণের মধ্যে। আমাদের জীবনে, জগতে, প্রকৃতিতে যা-কিছু ঘটনা ঘটে তার কোনা-না কোনো একটি বুদ্ধিগ্রাহ্য কারণ

রয়েছে। এই কারণ (cause)-ই বাস্তব জগতের প্রবহমান অস্তিত্বের মৌলসূত্র। প্রকৃতির বুকে, সজীব নির্জীব অস্তিত্বের সাম্রাজ্যে, প্রতিটি ঘটনা ঘটে যায় এক নির্দিষ্ট নির্ভুল নিয়মে। বিজ্ঞানের কাজ হল এই নিয়মটিকে খুঁজে বার করা, তার চরিত্র অনুধাবন করা ও তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্ধারণ করা, এবং আয়ত্ত করা প্রামাণ্য জ্ঞানকে সূত্রবদ্ধ করা। সভ্যতার ঊষাকাল থেকেই প্রকৃতির অতল অসীম রহস্যের মধ্যে অবগাহন করে মানুষ তিল তিল করে এক-একটি রহস্য উদ্ধার করেছে, আয়ত্ত করেছে নবীন উন্মেষশালিনী জ্ঞান, জন্ম নিয়েছে বিজ্ঞান। অবশ্য সেই প্রাথমিক পর্যায়ে বিজ্ঞানের সুসংহত কোনো তত্ত্বগত কাঠামো ছিল না। নিছক ব্যবহারিক (pragmatic) ও অনুমানভিত্তিক (speculative) প্রয়োগের সীমিত গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল বিজ্ঞানের শৈশব। সেই আদিযুগের মানুষকে প্রতিদিন লড়তে হয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে জীবনযাপনের দৈনন্দিন প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে। শীতের কামড়, গ্রীষ্মের দাবদাহ, শত্রুর আক্রমণ, খাদ্য সংগ্রহ, আকাশীয় রহস্যের ভয় ও উৎকণ্ঠা---ইত্যাদি যাবতীয় প্রতিকূলতাকে নিত্যসঙ্গী করে রহস্যময় নির্মম প্রকৃতির পরাধীনতা থেকে নিজেকে মুক্ত করায় নিয়ত প্রয়াসী ছিল মানুষ। সেদিন বিচিত্র প্রকৃতিকে, প্রকৃতির নিয়ম-ছন্দ-বৈশিষ্ট্যগুলিকে, সে লক্ষ্য করেছে গভীর আগ্রহে। তারপর ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতা থেকে সমাধানসূত্রের অনুমান, ক্রমাগত ব্যবহারিক দ্বন্দ্ব থেকে সঠিক সূত্রটির অনুসন্ধান, এবং কার্যকারণ সম্পর্কের একটি কার্যকরী মডেল নির্ধারণ।—এভাবেই তখন জন্ম নিয়েছিল বিজ্ঞানের অঙ্কুর (rudimentary science) এবং একথা অনস্বীকার্য যে সেই অনুন্নত অসংস্কৃত জনসমাজের হাতে জন্ম নেওয়া ব্যবহারিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে উৎপন্ন জ্ঞানাঙ্কুরই পরবর্তীকালের উন্নত প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের আঁতুড় ঘর রচনা করেছিল। ডোঙা-ভেলা-ডিঙি-নৌকো-বজরা-জলযান নির্মাণের এই সিঁড়ি বাওয়া উত্তরণ দেখলে মনেই হয় যে আদিম উপকূলবাসী জনগোষ্ঠী স্বতই কারিগরিবিদ্যা ও উদগতিবিদ্যার (hydrodynamics) সূচনা করেছিল। ইওরোপীয় কিমিয়াবিদ্যা এবং ভারতীয় গাছ-গাছড়ার আয়ুর্বেদচর্চা অবশ্যই আধুনিক রসায়নশাস্ত্র ও ভেষজ বিজ্ঞানের (pharmacology) উদ্ভাবনের সূত্র দেখিয়েছে---ঠিক যেমনটি ঋণগ্রস্ত আজকের উন্নত চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রাচীন অশিক্ষিত 'কোয়াক'দের ডাইনিবিদ্যার (witchcraft) কাছে। এমন কি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রাচীন যাদুবিশ্বাস থেকে আপাতরহস্যময় প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর নকল তোলার সামাজিক বা ধর্মীয় প্রথা ব্যাপক সাধারণ মানুষের সৃজনশীল কল্পনাশক্তি ও 'দৈব'কে চ্যালেঞ্জ জানানোর বাসনার পরিচয় বহন করে।...

অর্থাৎ সভ্য জগতে বিজ্ঞানের উদ্ভব, বিবর্তন, ও বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে উন্নয়নশীল মানবপ্রজাতির অস্তিত্বরক্ষার লড়াই, প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সঙ্গে নিয়ত দ্বন্দ্ব এবং তা থেকে উত্তরণের প্রক্রিয়া। মাত্র কয়েক শো বছরের আধুনিক বিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র অর্জনের আগে পর্যন্ত প্রাচীন ব্যবহারিক বিজ্ঞান কয়েক হাজার বছর ধরে শ্রমনির্ভর সাধারণ মানুষের একান্ত নিজস্ব চর্চার বিষয় ছিল, তাদের প্রাত্যহিক জীবনচর্যার অঙ্গ হিসেবে; তাদের বিশ্বাস অভ্যাস আচরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল বিজ্ঞানের তত্ত্বভিত্তিহীন চর্চা। আজ অত্যাধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তির চোখ-ঝলসানো দ্যুতির আড়ালে আঁধারাবৃত রয়ে গেছে মানুষের সেই দ্বন্দ্ব-উদ্ভুত বিজ্ঞানমুখী মন। বিজ্ঞানের স্বরূপকে অনুধাবন করতে হলে এই ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল্গুধারাটিকে আমাদের বিবেচনায় আনা প্রয়োজন।

সেই প্রাচীনতম কাল থেকেই মানুষের এই ক্রমাগত দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত থাকার অন্তর্নিহিত মানসিকতা, প্রকৃতির অধীনতা থেকে নিজেকে মুক্ত করার প্রয়াস, অজ্ঞতা ও রহস্যময়তাকে প্রশ্ন আর কৌতূহলে বিদ্ধ করে সত্যকে জানার আকাঙ্ক্ষা—এ সবই মানবপ্রজাতির একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, অন্য জীবের এ ধর্ম নেই। বিজ্ঞানের উদ্ভবের পেছনেও রয়েছে মানুষের সেই সহজাত স্বাধীনতালিপ্সা এবং সত্য নির্ধারণের অদম্য বাসনা। এরই সুবাদে মানুষের প্রকৃত সত্য উপলব্ধির জন্য নিরন্তর জিজ্ঞাসাপ্রবণতা সুপ্তভাবে এখনো, এই আধুনিককালেও, সমান সজীব। ফলে বিজ্ঞানবুদ্ধিতে বিপুলভাবে অগ্রগমনের পরও আধুনিক উন্নতযুগের মানুষের মনে প্রশ্ন এসে নাড়া দেয়— কে এই প্রকৃতির অমোঘ নিয়মগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করছে? কে এই বিশ্বসংসারের আদি স্রষ্টা? মৃত্যুর পর মানবজীবনের অস্তিত্ব কার কাছে গিয়ে বিলীন হয়?... ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ অদেখা কোনো কর্তৃত্বময় ব্যক্তিসত্তার খোঁজ আমাদের মনের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায়। এইসব স্বতঃস্ফূর্ত প্রশ্নগুলির সহজ-সরল উত্তর বিজ্ঞান এক কথায় দিতে পারে না, আমাদের মন সন্তুষ্ট হয় না। ফলে সময়ে-অসময়ে জীবন সংকটের নানা মুহূর্তে অজ্ঞাত কোনো এক 'সত্তা' বা চালিকাশক্তির ওপর নিখাদ আত্মসমর্পণের প্রবণতা মানুষের রয়ে যায়। তাই আমরা দেখি আপদে দুর্বিপাকে অনিশ্চয়তায় পুজা-প্রার্থনা-ধাতু-রত্ন-তন্ত্র-মন্ত্র অধিকাংশ মানুষকে সহজেই কব্জা করতে পারে; স্বাভাবিক নিয়মে ঘটে যাওয়া কোনো দুর্ঘটনা বা বিপর্যয়ে মানুষ অদৃষ্ট, ভবিতব্য, ভাগ্যফলকে দায়ী বলে মনে করে নেয়। আসলে জ্ঞানবুদ্ধি হওয়ার বয়স থেকেই আমরা দৃশ্য বা অদৃশ্য কোনো 'কর্তা'র ছত্রছায়া উপভোগ করতে শিখি, তাতে অভ্যস্ত হয়ে যাই। এই অভ্যাস আমাদের মস্তিষ্কের কোষে কোষে গ্রথিত হয়ে গেছে যেন। ফলে তেমন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত আমাদের কাছে অচেনা অসম্ভব লাগে যখন বলা হয়—প্রকৃতির কোনো পরিচালক 'সত্তা' নেই, সে নিজেই নিজেকে

পরিচালিত করে স্বতঃই সৃষ্টি হওয়া অমোঘ কতগুলি নিয়মে, কোনো 'পরম শক্তিময় কর্তা' ব্যতিরেকেই। বিজ্ঞানের ফলশ্রুতিতে উদ্ভুত এরকম সব নব-নব ধারণার কারণে শিক্ষিত মানুষের মনের ভেতরেও মাঝেমধ্যেই উঠে আসে মূর্ত আর বিমূর্তের সংঘাত।

> Quest for freedom and search for truth constitute the basic urge of human progress ... Increasing knowledge of nature enables man to be progressively free from the tyranny of natural phenomena, and physical and social environments. Truth is the content of knowledge.
>
> — **M. N. Roy, New Humanism.**

বিজ্ঞানের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যেই প্রতিনিয়ত আঘাত আসে বিশ্বাসের অচলায়তনে, সত্য জাগ্রত হতে চায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে। চার পাশের দুনিয়ায় যা কিছু বস্তু, যা কিছু ঘটনা মানুষের অভিজ্ঞতায় এসেছে, বিজ্ঞান সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ অবস্থানে থেকে তাকে পর্যবেক্ষণ করেছে, প্রশ্ন করেছে, ব্যাখ্যা খুঁজেছে, নির্দিষ্ট সূত্র বা তত্ত্ব খাড়া করতে চেয়েছে, তাকে ক্রমান্বয়ে প্রমাণ করেছে, শেষে সেই প্রামাণ্য সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করেছে। এই প্রক্রিয়ায় আদিম মানব-সমাজ থেকে আজকের আধুনিক বিশ্ব পর্যন্ত বিজ্ঞান যতই বিকশিত হয়েছে ততই ধাক্কা খেয়েছে মানুষের চিন্তাজগতে পরম শক্তি ও চরম সত্যের বোধ। বিজ্ঞানের বিচারে পরম বা চরম (Absolute) বলে কিছু থাকে না। নতুন জ্ঞান, নতুন তথ্য, নতুন সিদ্ধান্ত পুরোনোকে অনায়াসে সরিয়ে দেয়, 'সত্য' এগিয়ে যায় আরো সঠিকতার দিকে। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে আজকে আবিষ্কৃত বিজ্ঞানের কোনো সত্য আগামীকাল মিথ্যা বা বাতিল প্রমাণিত হতে পারে বলে বিজ্ঞানের যে কোনো সিদ্ধান্তকেই অ-নির্ভরযোগ্য বলে ভাবতে হবে। আসলে বিজ্ঞান তার সমসাময়িক কালে সংগৃহীত তথ্য ও জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রামাণ্য সত্য নির্ধারণ করে। জ্ঞান বৃদ্ধি হলে সেই সত্য আরো গভীরতর স্তরে পৌঁছয় মাত্র। সপ্তদশ শতাব্দীর নিউটনীয় বলবিদ্যা (Newtonian mechanics) মানুষের কাছে বস্তুজগতের যে সত্য রূপটি উপস্থাপিত করেছিল, বিংশ শতাব্দীর আধুনিক তরঙ্গ-বলবিদ্যা (wave mechanics) বস্তুজগতের অন্তর্নিহিত চরিত্রকে আরো নিখুঁতভাবে বুঝিয়েছে। এতে নিউটনের গুরুত্ব খাটো হয় নি কারণ অতীতের নিউটনীয় সত্য বর্তমানের বৃহত্তর সত্যে উত্তরণের সোপান রচনা করে দিয়ে গেছে। কিংবা যদি 'ইথার' ধারণার কথা ধরা যায়—বিশ্ব চরাচর জুড়ে এই 'ইথার' নামক মাধ্যমটির অস্তিত্ব দীর্ঘকাল বিজ্ঞানীরা সত্য বলেই জানতেন। কিন্তু এখন ইথার আর সত্য নয়। বিংশ শতাব্দীতে এসে ইথার পরিত্যক্ত হয়েছে তরঙ্গ-প্রবাহের নতুনতর বৈজ্ঞানিক সত্যের তাড়নায়; এবং এই পরিবর্তন বা অগ্রগমন ঘটে বিজ্ঞানেরই নিজস্ব প্রক্রিয়া অনুসরণ করে।

Scientists can only claim to hope they are right, pending further information. The greatest scientists have been wrong on this point or that - Newton on nature of light. Einstein on his views of the uncertainty principle, and this does not lessen respect for their achievements. Scientists expect to be improved on and corrected, they hope to be. Science has its "authority' but it is an open and nonauthoritarian authority.

- Isaac Asimov

এই পরিবর্তনশীলতাই বিজ্ঞান চরিত্রের প্রখরতম বৈশিষ্ট্য। এরই কারণে প্রশ্ন-যুক্তি-প্রমাণ-প্রগতির উপাদানে সমৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক দর্শনের কাছে স্থবির-বিশ্বাসবদ্ধ-অপরিবর্তনীয় কোনো দর্শন কিছুতেই গ্রহণীয় হয়ে ওঠে না। এরই ফলে বিজ্ঞানের একেবারে বিপরীত মেরুতে অবস্থান চিহ্নিত হয়ে যায় যার, তার নাম 'ধর্ম'। বিজ্ঞানের ইতিহাসে দেখা যাবে বার বার একেকটি বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন বা সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় বিশ্বাসে ফাটল ধরিয়েছে, দ্বন্দ্ব-সংঘাত এসে গেছে বিজ্ঞানের অনিচ্ছাতেই। সপ্তদশ শতাব্দীতে, ইতালীর গ্যালিলিও বাইবেল-বিরোধী মোটেও ছিলেন না, চার্চের সঙ্গে কোনোদিন সংঘাতে যান নি; তথাপি তাঁর দূরবীন উদ্ভাবনে গ্রহদের অস্থিরতা এবং পৃথিবীর ঘূর্ণনতত্ত্বের প্রমাণ থেকে বাইবেলে-এর অসারত্ব প্রকাশ পেয়েছে, যা চার্চকে ক্ষিপ্ত করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে, ইংরাজ প্রকৃতিবিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন খ্রীস্টীয় জীবসৃষ্টিতত্ত্বের বিরোধিতা করার লক্ষ্যে মোটেও তাঁর বিশ বছরব্যাপী অসামান্য পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা চালান নি; তবুও ডারউইন-এর মানব ও জীবকুলের বিবর্তন সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদের শিহরিত ক্রুদ্ধ করেছে। ...

আসলে চরিত্রগতভাবেই দু'য়ের অবস্থান দুই বিপরীত মেরুতে। বিজ্ঞান পরিবর্তনশীল, ধর্ম অবিনশ্বর। বিজ্ঞানে প্রশ্ন-সন্দেহ-পরীক্ষা সর্বদা স্বাগত, ধর্মবিশ্বাসে জিজ্ঞাসা নেই, প্রশ্ন করা গর্হিত কাজ। বিজ্ঞানের বই যদি হয় নিত্য ব্যবহারে মসৃণ উজ্জ্বল, ধর্মীয় শাস্ত্রগ্রন্থ হবে ঝুল-ধূলিতে আবৃত পুরা-নিদর্শন। সত্যি কথা বলতে কি, বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে দেখলে বলা যায়—ধর্মজ্ঞান অজ্ঞানতারই সামিল। কেননা, যদি অজ্ঞানতা থাকে তা হলে নতুন লব্ধ জ্ঞান দিয়ে পুরোনো জ্ঞান বা বিশ্বাসকে পাল্টানোর প্রয়োজনও পড়ে না।

In science men change their opinions when new knowledge become available, but philosophy in the minds of many is assimilated rather to theology than to science. A theologian proclaims eternal truths, the creeds remain unchanged. ...Where nobody knows anything, there is no point in changing your mind.

- Bertrand Russell.

কাজেই প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বিজ্ঞানের অগ্রগতি বলতে কেবল ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অগ্রগতির চমৎকারিত্বই নয়, একই সঙ্গে দর্শন ও চিন্তনের অগ্রগতিকেও বোঝা দরকার; কারণ ব্যবহারিক অগ্রগতির প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতিতে জনমানসে চিন্তা-চেতনায় আলোড়ন আসে। আবার জনচেতনার প্রেক্ষাপটেই রচিত হয় সমাজ-কাঠামোর রূপরেখা, রাজনৈতিক মতাদর্শ।

কিন্তু সমাজবিবর্তনের ঐতিহাসিক ধারাকে অনুসরণ করে আমরা যদি বিজ্ঞানের প্রভাবে সমাজ-সংস্কৃতির গুণগত উন্নয়নকে লক্ষ্য করি তা হলে এক স্পষ্ট অসংগতি, প্রকট বৈষম্য দেখতে পাব বর্তমান দুনিয়ায়। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বৈপ্লবিক প্রসারের প্রেক্ষাপটে মানুষের ব্যবহারিক জগৎ ও চেতনার জগতে মস্ত বিভাজন বিকট গহ্বর রচনা করে আছে। যে বিজ্ঞানের রোমাঞ্চকর প্রাযুক্তিক প্রয়োগ আজ বিপুলভাবে বিস্তৃত, সেই বিজ্ঞানের পদ্ধতি-প্রয়োগ ঘটে নি সাধারণ মানুষের চিন্তায় ভাবনায় মননে।

'বিজ্ঞান'-এর মধ্যেই সুপ্ত রয়েছে 'বিজ্ঞানমনস্কতা'র বীজ। এই বিজ্ঞানমনস্কতার অর্থ কেবল বিজ্ঞানের তথ্য-তত্ত্বে বিজ্ঞ বা বিশেষজ্ঞ হওয়া নয়, এর তাৎপর্য একজন ব্যক্তির মানসিকতা দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বাস ও আচরণের মধ্যে প্রকাশিত হওয়ার কথা। বিজ্ঞানের নিরপেক্ষ, তথ্যনিষ্ঠ, যুক্তিনির্ভর পদ্ধতির মধ্যে সঞ্চিত রয়েছে চেতনা বিকাশের অমিত সম্ভাবনা। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগেই একজন সাধারণ মানুষ তার দৈনন্দিন ভাবনায়, সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চিন্তায়, বিশ্বাসে-অবিশ্বাসে, সঠিক ন্যায়সঙ্গত মানবিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে, আত্মনির্ভরতা অর্জন করতে পারে, জীবনের সামগ্রিক মূল্যবোধকে উপলব্ধি করতে পারে। এহেন পরিশীলিত মন গড়ে উঠলেই আমরা তাকে বিজ্ঞানমনস্ক বলতে পারি। কিন্তু এই কাঙ্ক্ষিত মনস্কতাকে আমরা সেভাবে খুঁজে পাই না আমাদের চার পাশে। বিজ্ঞান আছে, বিজ্ঞানশিক্ষা আছে, বিজ্ঞানমনস্কতা নেই। ''বিজ্ঞান''-এর অন্তর্নিহিত সেই চেতনার সুপ্ত বীজটির যথাযথ জলসিঞ্চনের অভাবে অঙ্কুরোদ্গম আর হয় না। তাই ...

Science temper is of universal applicability and has to permeate through our society as the dominant value system powerfully imfluencing the way we think and approach our problems - political, social, economic, cultural and educational.

- A Statement from Nehru Centre.

তাই আমরা দেখি কুসংস্কার, জ্যোতিষ, নিয়তি-নির্ভরতা, অতীন্দ্রিয়বাদ, ধর্মবিশ্বাস, অপচিকিৎসা, জাতিগত অসাম্য, নারী-পুরুষ বৈষম্য ইত্যাদি যাবতীয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যাধি দিব্যি কায়েম হয়ে আছে আজও। কেবল অশিক্ষিত জনসমষ্টির মধ্যেই নয়, শিক্ষিত মহলেও অবৈজ্ঞানিক মানসিকতা গভীরভাবে—কখনো কপট কৌশলের আড়ালে—কাজ করে চলেছে। পদার্থবিজ্ঞানীর প্রচুর নিষ্ঠায় হরস্কোপ চর্চা, তুখোড় চিকিৎসকের অগাধ ঈশ্বর ভরসা, সমাজতত্ত্বের অধ্যাপকের নারী স্বাধীনতায় ঘোর আপত্তি। অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসেও সর্বস্তরের মানুষই উন্নত বিজ্ঞানকে শুধুই ভোগবাদী ভূমিকায় পেতে চাইছে, এর অন্তরালের বৈজ্ঞানিক দর্শনকে চেতনায় আত্মস্থ করতে পারে নি। ...কেন বিজ্ঞানের এই অসম বিকাশ?

এর উত্তর কিন্তু বিজ্ঞান-ইতিহাসের কাঠামোর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না, তাকাতে হবে কাঠামোর বাইরে—সমাজনীতি অর্থনীতি রাষ্ট্রনীতি শিক্ষানীতির দিকে। ভাবতে হবে বিজ্ঞানের সঙ্গে জনশিক্ষার সংযোগের প্রশ্নটি নিয়ে। বিজ্ঞানবোধের গোড়ার কথা হল পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিজ্ঞানের পাঠ ও পদ্ধতিকে কাজে লাগানো। এই কাজটিই হয় নি। ...প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের সঙ্গে ব্যাপক জনসাধারণের প্রকৃত সম্পর্ক পর্যালোচনা করতে গেলে প্রাচ্য তথা ভারত এবং পাশ্চাত্যের চিত্রকে পৃথকভাবে দেখতে হবে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, আধুনিক বিজ্ঞানের পীঠস্থান পাশ্চাত্য দেশই—ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের উন্নতি সেই পর্যায়ে আদৌ হয় নি বিগত কয়েক শতক ধরে। আজকের ইওরোপ-আমেরিকায় ভাগ্যচক্র বা উইজা বোর্ড, ফ্লাইং সসার বা উফো, টেলিপ্যাথি, ই এস পি, ইত্যাদি ভুয়াবিজ্ঞানের (pseudo science) উপস্থিতি কিছু মাত্রায় বর্তমান থাকলেও সামগ্রিকভাবে পাশ্চাত্য সমাজ ধর্মান্ধতা-কুসংস্কার-অধ্যাত্মবাদের দাপট থেকে মুক্ত থাকতে পেরেছে—যদিও বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সুবর্ণযুগে, অর্থাৎ বিগত চার-পাঁচশো বছরে, ফলপ্রসূ গবেষণাগুলিতে সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ছিল না; বরং দূরবীন স্টিম-ইঞ্জিন বিদ্যুৎ ও উচ্চতর গণিত আবিষ্কারের পরপরই বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ-লালিত প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র অর্জন করেছে। তবু কিন্তু সেখানে সাধারণ লোকসমাজে যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানমনস্কতার উল্লেখযোগ্য প্রসার যে দেখা গেছে তার প্রধান কারণ বলা যায়—ইওরোপে বিকাশশীল বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের চমৎকার সম্মিলন। যে সময় কোপার্নিকাস কেপলার নিউটন পাস্তুর ডারউইন আইনস্টাইন বিজ্ঞানের বিরাট সৌধগুলি একে একে রচনা করে চলেছেন, সে সময়ই পাশাপাশি দেখা গেছে ডেকার্তে স্পিনোজা'র যুক্তিবাদ, রুশো ভলতেয়ার 'এনসাইক্লোপেডিস্ট'দের নিরীশ্বরবাদী চিন্তা, মার্কস এঙ্গেলস-এর বস্তুবাদী দর্শন, এবং সর্বোপরি ইওরোপীয় রেনেশাঁ ও শিল্প-বিপ্লবের জোয়ার, এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বিকাশ। ফলত এক উন্নত অনুকূল বাতাবরণে গোটা পাশ্চাত্য দেশ জুড়ে ব্যাপক স্তরে আর্থ-সামাজিক বিকাশ ঘটেছে, আর তারই ফলশ্রুতিতে এসেছে সেখানকার সাধারণ মানুষের চেতনাগত মানোন্নয়ন।

ভারতের বুকে জনচিত্তের বিজ্ঞান-প্রভাবিত উন্নয়ন

আর্থ-সামাজিক বিকাশ এই পথে এগোয় নি, বরং; বার বার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, জ্ঞানচর্চা রুদ্ধ হয়েছে। প্রাচীন ভারতে যুক্তিনিষ্ঠ বস্তুবাদী দর্শন, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, কৃষি, চিকিৎসা-বিজ্ঞান ইত্যাদির চর্চা প্রভূত উন্নতি লাভ করেছিল দেড়-দু' হাজার বছর আগে। বরাহমিহির, চরক-সুশ্রুত, চার্বাক প্রমুখ মনীষা অত্যন্ত উচ্চমানের জ্ঞানচর্চা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করেছিলেন, কিন্তু বিপরীতে ধর্মচর্চার সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠিত শক্তির ভূমিকা তখন ছিল স্পষ্টতই দমনকারী। সেই প্রতাপশালী ধর্মীয় কর্তৃত্বে মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞানস্পৃহা, বস্তুবাদ ও যুক্তিবাদের বিকাশ ভীষণভাবে ব্যাহত প্রতিহত হয়। সুশ্রুত শল্য চিকিৎসাশিক্ষায় শবব্যবচ্ছেককে অপরিহার্য বলেছিলেন, প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা ভিন্ন জ্ঞান আয়ত্ত করা যায় না— এই ছিল তাঁর অভিমত। কিন্তু মনু এসে বাদ সাধলেন। বললেন, শবদেহ স্পর্শ করলে ব্রাহ্মণের পবিত্র শরীর অশুচি হবে। অতএব মনুর বিধানের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্যে শিক্ষার্থীদের শব-ব্যবচ্ছেদ বন্ধ হলো, চিকিৎসাবিজ্ঞান চর্চার একটি শাখার অগ্রগতি স্তব্ধ হলো। ধর্মীয় নির্দেশেই শিল্পকলা ও শাস্ত্র চর্চা, বিজ্ঞানবুদ্ধির চর্চা রইল উচ্চবর্গীয় শ্রেণীর কুক্ষিগত, আর কারিগরি বা কারুকৃতি সংক্রান্ত বিভিন্ন হাতে-কলমের কাজ রাখা হলো নিম্নজাতির আওতায়। এই পরিষ্কার বিভাজনের ফল হল অত্যন্ত ক্ষতিকারক। ভারতীয় সমাজের অগ্রণী বুদ্ধিজীবী শ্রেণী হাতে-কলমে কাজের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষণ সম্পর্কে, কার্য-কারণ সংযোগ সম্পর্কে, নিতান্ত অনাগ্রহী ও অজ্ঞ রয়ে গেল। এবং অন্য দিকে শ্রমজীবী নিম্নবর্গীয় শ্রেণী যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ও মননশীল পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে আপন কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ ঘটাতে পারল না। এইভাবে জাতিভেদ ও শ্রমভেদ প্রথার বিষময় ফল হিসেবে একে একে বাস্তব পরীক্ষাভিত্তিক আরোহী-বিজ্ঞানের নানা প্রাণবন্ত শাখা শুকিয়ে গেল। ...ভারতের সাধারণ জনসমষ্টির বিজ্ঞান চেতনা থেকে বিচ্ছিন্নতার শুরু সেই ব্রাহ্মণ্য-শাসিত যুগ থেকেই; জনচিত্তে আত্মনির্ভরতার অভাবের সূত্রপাতও হয় তখনই। ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাসে সে এক বিস্তীর্ণ অন্ধকারের যুগ।

The arts being thus relegated to the low castes and the professions made hereditary ...the intellectual portion of the community being thus withdrawn from active participation in the arts, the how and why of phenomena - the co-ordination and effect - were last sight of - the spirit of enquity gradually died out among a nation natually prone to speculation and metaphysical subtleties and India for once bade adien to experimental and inductive sciences. Her soil was rendered morally unfit for the birth of a Boyale, a Descartes or a Newton and her very name was all but expunged from the map of the scientific world.

- Sir P. C. Roy, A History of Hindu Chemistry, 1904, p. 195.

পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শাসন-যুগে ইংরাজরা এদেশে শিক্ষাবিস্তার ঘটিয়েছিল নিজেদের কার্যোদ্ধারের স্বার্থেই। ইংরাজি-শিক্ষার সুবাদে তখন প্রগতিশীল ভাবনা ও বিজ্ঞানবুদ্ধির ছিটেফোঁটা যা একটু আয়ত্ত হয়েছিল, সে সবই মুষ্টিমেয় ইংরাজ-অনুগত শহরবাসীর ভোগবাদী মানসিকতায় রসদ জুগিয়েছে মাত্র, সাধারণ জনসমষ্টির কোনো উপকার দেয় নি সে বিজ্ঞানের উচ্ছিষ্ট।

তবে এ দেশের এই সামাজিক চিত্রপট একটু একটু করে পাল্টেছে বর্তমান শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে। বিজ্ঞানের জনপ্রিয়তা ও আনুষঙ্গিক জনচেতনা ধীরে ধীরে উল্লেখ করার মতো একটি মাত্রা পেয়েছে। সর্বস্তরের মানুষের সামগ্রিক জীবনমান উন্নয়নে বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারের গুরুত্ব ক্ষীণভাবে হলেও অনুভূত হয়েছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর নবীন ভারতের গঠন-কাঠামোয় প্রতিটি ভারতবাসীর মৌলিক প্রয়োজন হিসেবে বিজ্ঞানমনস্কতাকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, যদিও কার্যক্ষেত্রে এটি কাগুজে অলংকার হিসেবেই থেকে গেছে, কোনো জাতীয় কর্মসূচি বা অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে বিজ্ঞানমনস্কতা বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি তার প্রাপ্য গুরুত্ব কখনোই পায় নি। CONSTITUTION OF INDIA -Part IVA Fundamental Duties of Citizens 51 A. It shall be the duty of every citizen of India...

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of enquiry and reform;...

তবে গণভিত্তিক কল্যাণকামী সংগঠনগুলির হাত ধরে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমে এক উল্লেখযোগ্য অবয়ব পেতে থাকে বিগত ত্রিশ-চল্লিশ বছরের সামাজিক প্রেক্ষাপটে। এই সময়টায় দেশের বুকে রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে নানা রাজনৈতিক-সামাজিক আন্দোলনের আলোড়ন উঠেছে। তা থেকে জনসাধারণের আত্মনির্ভর যুক্তিচেতনা ও অধিকারবোধের বিষয়ে নতুন নতুন ভাবনা উঠে এসেছে। কিছু সমাজসচেতন গণসংগঠক ও মুক্তমনা চিন্তাবিদ উপলব্ধি করেছেন যে সুস্থ-মুক্ত-মানবিক এক নতুন সমাজ গড়ে তুলতে, মানুষের জীবনমানের প্রকৃতই উন্নয়ন ঘটাতে, কেবল প্রচলিত রাজনৈতিক পার্টির লড়াই যথেষ্ট নয়।, এর পরিপূরক শক্তি হিসেবে ব্যাপক মানুষের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ চাই, চাই বিজ্ঞানমনস্কতার ব্যাপক প্রসার। অর্থাৎ এই দর্শনকে সামনে রেখে গড়ে তোলা চাই এক পরিপূরক গণ আন্দোলন।

এরকম কিছু উপলব্ধি ও পরীক্ষামূলক প্রয়াসের সূত্র ধরেই

সত্তর-আশির দশকে দেশে কিছু বিজ্ঞানমুখী কর্মসূচি ছোটো ছোটো স্তরে গৃহীত হতে দেখা যায় এবং তখনই, বিশেষত আমাদের এই বাংলায়, 'গণবিজ্ঞান' বা জনবিজ্ঞান শব্দটির সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। অন্যায় অসংগতি অসাম্যের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সচেতন ও সক্রিয় করার লক্ষ্যে, সমাজকে পরিবর্তিত করার স্বপ্নে, বিজ্ঞানমনস্কতা জনগণের অন্যতম শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত হতে থাকে। সূত্রপাত হয় গণবিজ্ঞান আন্দোলনের।

নব্যচরিত্রের এই সামাজিক-রাজনৈতিক ভাবনার দুটো দিক রয়েছে। প্রথমত 'গণ' বা 'জন' শব্দের সঙ্গে 'বিজ্ঞান' শব্দটির এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণের মধ্যে বিজ্ঞানকে সাধারণ সাদামাটা মানুষের নিজস্ব আওতার বিষয় বলে ভাবা হয়; কেবল বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, বিশেষজ্ঞ আর বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের কুক্ষিগত না থেকে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হাটে-মাঠের মানুষের ভালোমন্দ সুখদুঃখ ন্যায়অন্যায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার ভরসা জন্মায়। এবং দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞানের তথ্য, তত্ত্ব, সিদ্ধান্ত, পদ্ধতিকে হাতিয়ার করে নিজেদের অভাব বঞ্চনা নিপীড়ন প্রতারণার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ আপন প্রয়াসে আত্মনির্ভরতায় সংঘবদ্ধ আন্দোলনে সামিল হওয়া—যে ভূমিকা মানুষ প্রথাগত রাজনৈতিক আন্দোলনে পাচ্ছে না, যে সংকটমোচনের রাস্তা গরীব-গুর্বো নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত মানুষ বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান বা পার্টির কাজকারবারের মধ্যে দেখছে না। নির্দিষ্ট কোনো 'লাইন' বা 'মডেল' অনুসরণের পরিচিত প্রক্রিয়া থেকে পৃথক এই গণবিজ্ঞান আন্দোলন সমস্যা-সংকটের বিশেষ বিশেষ 'ইস্যু'কে কেন্দ্র করে সংগঠিত হতে দেখা যায়—হাটে মাঠে পাড়ায় অঞ্চলে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিমণ্ডলে, প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিক সামাজিক মানসিক ব্যবহারিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে, অসংহত সংঘবদ্ধতায় সক্রিয় থাকছে এই আন্দোলনগুলি। কুসংস্কার, প্রথাসর্বস্বতা, ধর্মান্ধতা, পরিবেশ দূষণ, জনবিরোধী ওষুধনীতি, অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা, মানবাধিকারহানি, নারী অবদমন, ধ্বংসাত্মক উন্নয়ন, জাতিভেদ বর্ণভেদ, এবং বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অপপ্রয়োগ—এরকম নানাবিধ প্রত্যক্ষ সংকট যা মানুষের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করে দিতে চায়, ব্যাধিগ্রস্ত করে তোলে দৈনন্দিন জীবন, সেই বিষয়গুলিই গণবিজ্ঞান আন্দোলনের আওতায় আনা হচ্ছে।

নিতান্তই নবীন, দু-তিন দশকের এই স্বতন্ত্র চরিত্রের আন্দোলন অবশ্যই এখনো অপরিণত, পরীক্ষামূলক স্তরে রয়েছে বলা যায়। এর বিস্তৃতি এই মুহূর্তে বিশাল কিছু নয়। রাষ্ট্রব্যবস্থা পাল্টানোর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল স্রোতের সঙ্গে এই গণবিজ্ঞান আন্দোলনের সংযুক্তির প্রক্রিয়া এখনো স্পষ্ট নয়। এর মতাদর্শগত ভিত্তি এখনো নির্দিষ্টভাবে রচিত নয়। আগামী দিনে এই আন্দোলনের প্রভাব কতখানি জনমানসের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাবে তা-ও জানা নেই। তথাপি, এক স্বপ্নময় সমাজমুক্তির প্রশ্নে বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারের এই প্রয়াস কিছু স্পষ্ট আদর্শগত ও পদ্ধতিগত প্রত্যাশার জন্ম দিতে চাইছে সন্দেহ নেই।

কিন্তু শেষ কথা বলতে গেলে এবং বিজ্ঞানকে মানতে গেলে বলতে হয়—বিজ্ঞানমনস্কতাই শেষ কথা নয়। ব্যক্তির পরিপূর্ণতা ও উন্নয়নে আরো কিছুর প্রয়োজন হয়। বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানমনস্ক কোনো ব্যক্তি দুর্নীতিগ্রস্ত উৎকোচপ্রিয় হতে পারে, নারী বিদ্বেষী ভোগী হতে পারে, ভণ্ড ভীরু কাপুরুষ হতে পারে। বিজ্ঞানবোধের প্রসার বা গণবিজ্ঞান আন্দোলন এরকম মলিন মনের মানুষদের চরিত্রশুদ্ধি ঘটাবে—তেমন সুযোগ নেই। সে ক্ষেত্রে বিজ্ঞানমনস্কতার বাইরেও সাংস্কৃতিক ও নৈতিক শাসন প্রয়োজন, প্রয়োজন উপযুক্ত রাজনৈতিক মতাদর্শের—পরিপূর্ণ ব্যক্তিগত, জাতিগত, দেশগত বিকাশের স্বার্থে।

A man's ethical behaviour should be based effectively on sympathy, education and social ties and needs: no religious basis is neccessary. Man would indeed be in a poor way if he had to be restrained by fear of punishment and hope of reward after death. ...

-Albert Einstein

বিজ্ঞানমনস্কতা একজন ব্যক্তিমানুষের আত্মিক উন্নতি ও অধিকার আদায়ের সহায়ক শক্তি হতে পারে কিন্তু নৈতিকতা ছাড়াও অবেগ-অনুভূতির জগতে বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ এখনো স্পষ্ট নয়। দুগ্ধপোষ্য শিশু যখন পরম আকুলতায় মাতৃস্তনে সুধা অন্বেষণ করে, যখন রাখালিয়া বাঁশির সুরের সঙ্গে সোনালি শিষের বাতাসি নৃত্যছন্দে হিল্লোল ওঠে, যখন বছর কুড়ি পরে 'তার সাথে দেখা' হলে শরীরের গহীন কোণে রক্ত ছলাৎ করে, যখন প্রিয়তমজনের মৃত্যুর পর হু হু করা নির্ভার মন ভেসে যায় অন্য কোনো লোকে ... তখন বিজ্ঞানের জায়গা কোথায়? স্পষ্ট করে লেখা নেই আজও এই সব অন্তর্লীন অনুভবের গতিপ্রকৃতির গণিত।

তাই ফের খেয়াল রাখতে হয় বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতায়। বিজ্ঞান মানবপ্রজাতির বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের সার্বিক মুক্তির মন্ত্র হাতে বসে নেই, বিজ্ঞান কোনো মুক্তিদাতা বা পরমাত্মার বিকল্পও নয়। সে শুধু আত্মনির্ভরতা ও অস্তিত্বরক্ষার শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে ওঠার সম্ভাবনায় সজীব ... যা উত্তরণের এক অপরিহার্য সোপান।

অনুষ্টুপ। সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক ত্রৈমাসিক। উনত্রিশ বর্ষ: দ্বিতীয় সংখ্যা, বিশেষ বিজ্ঞান সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত। উ মা

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা
২০ নভেম্বর, ২০১১
রবিবার বিকেল ৫টা, জীবনানন্দ সভাঘর,
বাংলা অ্যাকাডেমি
বিষয়: "ঘাড় কামড়ে থাকা নিরক্ষরতা ও আমাদের অবদান"
বক্তা: অধ্যাপক রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য

বিস্ময়কর মোবাইল ফোন: টু-জি, থ্রি-জি...

শ্যামল ভদ্র

সেলুলার মোবাইল টেলিফোন নেটওয়ার্ক দূর গ্রামগঞ্জ থেকে শহরে ব্যাপক বিস্তারলাভ করেছে বিগত কয়েক বছরের মধ্যে। ভারতবর্ষের ১২০ কোটি জনসংখ্যার প্রায় ৯ কোটি মানুষ এই মোবাইল ফোন ব্যবহার করে থাকে যা পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে একটি রেকর্ড এবং খরচও কম। আমাদের দেশে দূর সম্প্রচারের অবকাঠামো দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে যা আধুনিক শিল্পের অগ্রগতির নির্ণায়ক। কিছুদিন আগে অর্থাৎ ২০০১ সালে ৩জি সেলুলার মোবাইল পরিষেবা আমাদের দেশে চালু করা হয়। সেই সময় ছোটবড় প্রায় ৮৫টি টেলিকম সংস্থাকে লাইসেন্স প্রদান করা হয় যাতে দ্রুত দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই পরিষেবা ছড়িয়ে পড়তে পারে। টেলিফোন পরিষেবা সারা দেশজুড়ে ছোট ছোট সার্কেলে বিভক্ত এবং প্রতিটি সার্কেলে সরকারি-অসরকারি সংস্থাগুলির জন্যে স্পেকট্রাম বন্টন করা হয়। এদের মধ্যে বিএসএনএল, ভারতী টেলিকম, টাটা ইন্ডিকম-এর নাম উল্লেখযোগ্য। এরা প্রত্যেকে তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের টেলিকম নেটওয়ার্কের সাহায্যে টেলিফোন পরিষেবার কাজ করে এবং যাবতীয় টেলিকম নেটওয়ার্কের কাজকর্ম সমষ্টিগতভাবে তদারকি করে থাকে। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় হল যে পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ ২০১০ সালে আরও উন্নত মোবাইল পরিষেবা ৩জি স্পেকট্রাম বন্টনের জন্য দরপত্র (টেন্ডার) আহ্বান করা হয়। তখন দেখা যায় যে বিভিন্ন টেলিকম সংস্থার কাছ থেকে যে পরিমাণ রেভিনিউ কেন্দ্রীয় সরকার পেতে পারে তার পরিমাণ প্রায় ৬৮,০০০ কোটি টাকা। তখনই বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন ওঠে এবং কনট্রোলার অফ অডিটর জেনারেল (সিএজি) জানতে চায় যে ২জি স্পেকট্রাম বন্টনে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় ১,৭৬,০০০ কোটি টাকার মতো ক্ষতি কি করে হল। এটা সহজেই অনুমেয় যে খুবই কম দরে বিভিন্ন টেলিকম সংস্থাকে ২জি স্পেকট্রাম বন্টন করা হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ের ঘটনাবলী প্রায় সবারই জানা এবং সমগ্র বিষয়টি বিচারাধীন। এই প্রতিবেদনের মূল আলোচ্য বিষয় হল ১জি, ২জি, ৩জি .... স্পেকট্রাম কেনই বা এত গুরুত্বপূর্ণ সেলুলার মোবাইল পরিষেবার ক্ষেত্রে? প্রযুক্তির দিক থেকে এই পরিষেবা এত তাৎপর্যপূর্ণ কেন?

২জি—সেকেণ্ড জেনারেশন তারবিহীন (ওয়্যারলেস) প্রযুক্তি বাণিজ্যিকভাবে শুরু হয় সুদূর ফিনল্যান্ডে ১৯৯১ সালে। এরও আগে ১জি মোবাইল পরিষেবায় শুধু মোবাইল থেকে মোবাইলে কথা বলা যেত। অন্য কোনও সম্প্রচার সম্ভব ছিল না। অর্থাৎ ১জি পরিষেবা কখনই ডিজিট্যাল ফরম্যাটে কাজ করতে পারত না। কিন্তু ২জি মোবাইল পরিষেবা যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। সেই কারণেই ২জি পরিষেবা এখনও বিভিন্ন দেশে বহুল প্রচলিত এবং জনমানসে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। এখন প্রশ্ন হল ২জি ব্যবস্থায় লাভ কি! প্রথম সুবিধে হল এই ব্যবস্থা ডিজিট্যাল ফরম্যাটে সম্প্রচার সম্ভব। দ্বিতীয়ত, মোবাইল থেকে মোবাইলে কথা বলা এবং স্মল মেসেজ সার্ভিস (এসএমএস) একসাথে সম্প্রচার করা যায় যা ১জি পরিষেবায় সম্ভব ছিল না। মোবাইল পরিষেবা সাধারণত গ্লোবাল সিস্টেম ফর মোবাইল কম্যুনিকেশন (জিএসএম) এবং কোড ডিভিশন মাল্টিপল্ অ্যাক্সেস (সিডিএমএ) দ্বারা চালিত হয়। ২জি মোবাইল পরিষেবায় এসএমএস মারফৎ খুব দ্রুত ছোট ছোট মেসেজ আদানপ্রদান করা যায়। ইংরেজি লেটার এ, বি, সি ... ইত্যাদিকে ১০১১০১ ... ডিজিটের ফরম্যাটে সংকুচিত প্যাকেট তৈরি করে মোবাইল থেকে মোবাইলে এক্সচেঞ্জ মারফৎ পাঠানো যায়। বর্তমানে মোবাইল সম্প্রচারে সর্বোচ্চ ১৬০টি লেটার বা ক্যারেক্টার এসএমএস মারফৎ একযোগে পাঠানো যায়। শুধু তাই নয়, একটি এসএমএস একসাথে অনেকজনকে মুহূর্তের মধ্যে পাঠিয়ে দেওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ২জি মোবাইল পরিষেবায় শুধু কথা বলাই নয়, ব্যাংক ও অন্যান্য বাণিজ্যিক সংস্থার তাৎক্ষণিক হিসেবনিকেশের খবরও মোবাইল ফোনে পাওয়া যায়। আমরা দেখেছি আমাদের রাজ্যে গত নির্বাচনের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এসএমএস মারফৎ তাদের প্রচার চালিয়েছে। এক্ষেত্রে অবশ্যই কম্পিউটারের ব্যবহার অনেকাংশেই এই সুবিধে দিতে সক্ষম হয়েছে কারণ ২জি মোবাইল পরিষেবা কম্পিউটারের সাথে একযোগে কাজ করতে সক্ষম।

সম্প্রতি ৩জি (থার্ড জেনারেশন) মোবাইল পরিষেবা দেশের কিছু কিছু অংশে চালু করা হয়েছে। এই ৩জি পরিষেবার সুবিধে হল ভয়েস, ডাটা এবং ভিডিও এই তিনটিই একসাথে কাজ করতে পারে। অর্থাৎ ৩জি মোবাইল পরিষেবা ক্রিকেট খেলা থেকে শুরু করে সবকিছুই টেলিভিশন পর্দার মতো দেখতে পাওয়া যাবে। যেখানে ২জি পরিষেবায় ১৪৪ কেবিপিএস (কিলোবাইট পার সেকেন্ড) ক্ষমতায় সংকেত পাঠানো যায়। সেক্ষেত্রে ৩জি নেটওয়ার্কে এই স্পিড বা গতি ৩ এম বিপিএস (মেগাবাইট পার সেকেন্ড) অর্থাৎ ১০০০ গুণেরও বেশি। একটি তিন মিনিটের

গান (এম পি ৩) ২জি-র ক্ষেত্রে সম্প্রচারের সময় নেবে প্রায় ৮ মিনিট, ৩জিতে সেটা ১৫ সেকেন্ডেই সম্প্রচার করা যাবে। অর্থাৎ অনেক দ্রুত কাজ করার ক্ষমতা রাখে এই ৩জি পরিষেবা। বলা যায়, ৩জি মোবাইল হ্যান্ড-সেট একটি ছোটখাট কম্পিউটার। এই পরিষেবা আমাদের দেশে এখনও খুব বেশি জনপ্রিয় হতে পারেনি। কারণ এর খরচ অনেক বেশি এবং ৩জি মোবাইল হ্যান্ডসেট-এর দামও অনেক বেশি। আরও অন্যান্য সুবিধেগুলির মধ্যে ৩জি পরিষেবায় ভিডিও-কনফারেন্সিং, অ্যাক্সেস টু ওয়েব-নেটওয়ার্ক, ফ্যাক্স এবং ই-মেইল প্রভৃতি সুবিধে একই সাথে পাওয়া যায়। অর্থাৎ হাতের মুঠোয় সব সুবিধে। ভবিষ্যতে এই পরিষেবা হয়ত বা খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। শুধু তাই নয়, আমাদের দেশে রিলায়েন্স টেলিকম অরও উন্নত মোবাইল পরিষেবা ৪জি (ফোর্থ জেনারেশন) তাদের নিজেদের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সম্প্রসারণ শুরু করেছে। মূলত, ৩জি এবং ৪জি মোবাইল পরিষেবা একই ধরনের টেলিফোনের মাধ্যম ও নেটওয়ার্কের দ্বারা কাজ করে। তবে ৪জি-র ক্ষেত্রে প্রায় পুরোটাই ডিজিটাল ফরম্যাটে কাজ করে যেখানে নেটওয়ার্কের স্পিড বা গতি ১০০ এমবিপিএস-এরও বেশি। এই পরিষেবা সিডিএমএ সিস্টেম-এ কাজ করে যার বিভিন্ন ধরনের টেলিফোন এবং কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সাথে কাজ করার ক্ষমতা অনেক বেশি। ভবিষ্যতের লক্ষ্য হচ্ছে মোবাইল হ্যান্ডসেট-এ টেলিভিশন থেকে শুরু করে সমস্তরকম মাল্টি-মিডিয়া-র সুযোগসুবিধে ৪জি মোবাইল হ্যান্ডসেট-এ যাতে পাওয়া যায়। আজকের গ্লোবাল ভিলেজের যুগে শীঘ্রই সবকিছু হাতের মুঠোয় পেতে সেলুলার মোবাইল অবশ্যই বিশেষ ভূমিকা নেবে। আন্তর্জাতিক টেলিকম ইউনিয়ন (ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন —আই টি ইউ) প্রতিটি দেশকে একটি নির্দিষ্ট স্পেকট্রাম-এর সীমা বেধে দেয় যাতে প্রতিটি দেশ তাদের স্বকীয়তা বজায় রেখে যোগাযোগ ব্যবস্থা বজায় রাখতে পারে। এই স্পেকট্রাম বন্টন করার কাজ প্রতিটি দেশ নিজের মতো করে প্রয়োগ করে থাকে এবং স্পেকট্রামের টুকরো টুকরো ব্যান্ডউইড্ বিভিন্ন সংস্থাকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বন্টন করে থাকে নির্দিষ্ট চুক্তির ভিত্তিতে। ভবিষ্যতে এই বন্টন ব্যবস্থা আরও প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবে কারণ মোবাইল টেলিফোনের ব্যবহার আগামী কয়েক বছরে দ্বিগুণ হয়ে যাবে—যার বাণিজ্যিক সাফল্য প্রশ্নাতীত।

উ মা

ছড়া

কুসংস্কার

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাস্থ্য নিয়ে দেশটা আজও বোঝাই সংস্কারে
গ্রাম শহরে কত মানুষ ঠকছে বারে বারে,
রোগজ্বালাতে দেবদেউলে হত্যে দেবার আগে
চিকিৎসাকেই রাখতে হবে সবার পুরোভাগে।
নানান রোগে হাজার রকম টোটকা দেশে চলে
অবৈজ্ঞানিক বাছাই করে ফেলুন এসব জলে,
কাটলে সাপে ওঝার কাছে একটি বারও নয়
হাসপাতালে যেতেই হবে নেই কোনও সংশয়।
তাবিজ-কবচ ফুল মাদুলি বন্ধ্যা নারীর হাতে
বাঁধার চেয়ে চিকিৎসা চাই—ফল বেশি হয় তাতে,
কানের ব্যথা দাঁতের পোকা রাস্তাঘাটে সারাই
কিম্বা কোনও মনের রোগে তন্ত্রমতে ঝাড়াই—
চলবে নাকো এসব কিছু রাখতে হবে মনে
হিতে বিপরীত হয়ে যায় অনেক বিপদ আনে।
অর্থ ছাড়াও স্বাস্থ্য থাকে, থাকলে নতুন মন
সংস্কারের 'কু'টা ছেড়ে সংস্কৃত হোন।

উ মা

রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রকাশিত ২০১১ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্সে (এইচ ডি আই) দেখা যাচ্ছে ওপরের সারিতে থাকা দেশ যেমন নরওয়ে, অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাষ্ট্র ও নিউজিল্যান্ড তাদের কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) নিঃসরণের মাত্রা একেবারে নীচের সারির দেশগুলির (চাদ, মোজাম্বিক, বুরুন্ডি, নাইজার, কঙ্গো) থেকে অনেক বেশি। এমনকি এই উপমহাদেশের রাষ্ট্রগুলির (শ্রীলঙ্কা, চীন, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ) কার্বন-ডাই-অক্সাইডেও নিঃসরণের মাত্রা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। ধনী দেশের এই হাল কেন? সমীক্ষায় দেখা গেছে অত্যধিক যান চলাচল, ঘর ঠাণ্ডা ও গরম রাখার ব্যবস্থা করতে আর প্যাকেট খাবারের চাহিদার যোগান দিতে প্রচুর শক্তি উৎপাদন করতে হয়। যা আসে প্রধানত তেল থেকে।

তথ্যসূত্র: ইকনমিক টাইমস ৩.১১.২০১১

জলবায়ু পরিবর্তন পুনর্বিবেচনা

প্রধান লেখক: ক্রেইগ ইডসো (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), এস ফ্রেড সিঙ্গার (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) দ্য ননগভর্নন্টোল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (এন আই পি সি সি)-র দ্বারা প্রকাশিত।
অনুবাদক — অমিতাভ গুপ্ত

[*ক্রেইগ ইডসো এবং এস ফ্রেড সিঙ্গার ২০০৯-এ এন আই পি সি সি শিকাগো আমেরিকা থেকে ৮০০ পাতার একটি রিপোর্ট 'ক্লাইমেট চেঞ্জ রিকনসিডারড্'—এই নামে প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদনটি সংক্ষেপিত আকারে দিল্লীর লিবার্টি ইনস্টিউট প্রকাশ করে এবং ভারতবর্ষে ৬টি ভাষায় অনূদিত হয়। বর্তমানে লেখাটি লিবার্টি ইনস্টিটিউট-এর প্রধান বরুণ মিত্র-র সৌজন্যে প্রাপ্ত। বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি মনে করে প্রকাশ করা হল।*]

একটা বড় অপারেশন করার আগে একটা দ্বিতীয় মতামত নেওয়া ভাল নয় কি? আর এক জন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে নেবেন তো?

এবার একটা দেশের কথা ভাবুন। কোনও দেশ যখন এমন কোনও একটা সিদ্ধান্ত করার মুখে দাঁড়িয়ে থাকে, যে সিদ্ধান্তটি সেই দেশের অর্থনীতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে, এবং হয়তো দেশের বাস্তুতন্ত্রের ভবিষ্যৎও নির্ধারণ করে দেবে, তখন সেই সিদ্ধান্তটি করার আগেও একটা দ্বিতীয় মতামত নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে একটা 'টিম বি' তৈরি করে নেওয়ার প্রচলন আছে। গবেষকদের এই দ্বিতীয় দলটিও প্রথম দলের বিচার্য তথ্যপ্রমাণ নিয়েই কাজ করে। কিন্তু, এই দলটি সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছোতেই পারে। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত গবেষণায় দ্য ননগবর্নমেন্টাল ইন্টারন্যাশনাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (এন আই পি সি সি)-এর ভূমিকা ঠিক এটাই। রাষ্ট্রপুঞ্জের ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আই পি সি সি) জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত যে তথ্যগুলি পরীক্ষা করছে, এন আই পি সি সি-ও সেই তথ্য নিয়েই গবেষণা করছে।

২০০৭ সালে আই পি সি সি তিনটি খণ্ডে তাদের চতুর্থ অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টটি প্রকাশ করে। রিপোর্টটির নাম ক্লাইমেট চেঞ্জ ২০০৭ (আই পি সি সি-এ আর ৪, ২০০৭)। এই রিপোর্টে যে তথ্য আছে, তার সম্বন্ধে আই পি সি সি-র মত হল: 'জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সবচেয়ে বিস্তারিত এবং সম্পূর্ণ ও সবচেয়ে আধুনিক' তথ্য এবং 'জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে আগ্রহী যে কোনও ব্যক্তি বা সংস্থা, যেমন গবেষক, সরকারি সংগঠন এবং শিল্পমহলের কাছে এ বিষয়ে সবচেয়ে প্রামাণ্য নথি'। প্রশ্ন হল, এই দাবি কতটা ঠিক?

আই পি সি সি-র রিপোর্টের অন্যতম প্রধান প্রতিপাদ্য হল, 'বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিশ্বের গড় তাপমাত্রা যতখানি বেড়েছে, সেই বৃদ্ধির বেশির ভাগটাই খুব সম্ভবত হয়েছে মানুষের বিভিন্ন কাজকর্মের ফলে গ্রিনহাউস গ্যাসের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য' (নজরটান নিজস্ব)। এন আই পি সি সি-র গবেষণা একেবারে ভিন্ন কথা বলছে। এই সংস্থার গবেষণা বলছে, তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য প্রধানত দায়ী প্রাকৃতিক কারণ। লক্ষ করা প্রয়োজন, আমরা এই কথা বলছি না যে মানুষের তৈরি করা গ্রিনহাউস গ্যাসের ফলে একটুও উষ্ণায়ন ঘটা সম্ভব নয়, অথবা অতীতে তা ঘটেনি। আমাদের গবেষণা শুধু এই কথাটি বলছে যে মানুষের তৈরি গ্রিনহাউস গ্যাস খুব তাৎপর্যপূর্ণ কোনও ভূমিকা পালন করছে না।

আরও একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের উষ্ণায়ন মানুষের স্বাস্থ্য এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর কী প্রভাব ফেলবে। আই পি সি সি-র রিপোর্ট বলছে, বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে 'তাপপ্রবাহ, বন্যা, ঝড়, দাবানল এবং খরার ফলে মৃত্যু, রোগব্যাধি এবং দৈহিক আঘাতের পরিমাণ বাড়বে'। এই প্রশ্নটিতেও এন আই পি সি সি-র গবেষণা সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে: ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বাড়লে মানুষ এবং বন্য প্রাণীর পক্ষে পৃথিবী আরও বেশি বাসযোগ্য হয়ে উঠবে। পৃথিবী আরও নিরাপদ হবে, আরও স্বাস্থ্যকর হবে। আবারও মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, আমরা একবারও এই কথা বলছি না যে বিশ্ব উষ্ণায়ন ঘটবে না অথবা মানুষ এবং প্রাণিজগতের ওপর তার কোনও প্রভাব (ইতিবাচক বা নেতিবাচক) পড়বে না। বরং, আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, যাবতীয় তথ্যপ্রমাণ নির্দেশ করছে, উষ্ণায়ন চলতে থাকলে এবং বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বাড়তে থাকলে তার সামগ্রিক ফল মানুষ, গাছপালা এবং প্রাণিজগতের পক্ষে ইতিবাচক হবে।

আমরা আই পি সি সি-র চতুর্থ অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টের প্রথম দুটি খণ্ড 'দ্য ফিজিক্যাল সায়েন্স বেসিস' এবং 'ইমপ্যাক্টস, অ্যাডাপ্টেশন অ্যান্ড ভালনারেবিলিটি' অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে

পরীক্ষা করে দেখেছি। আমাদের মনে হয়েছে, ব্যবহৃত তথা এবং তার সাপেক্ষে আলোচনা অত্যন্ত বিতর্কিত। জলবায়ু পরিবর্তনের ভবিষ্যৎ চেহারাটিকে ভয়ঙ্কর হিসেবে দেখানোর জন্য এবং জলবায়ু পরিবর্তনে মানুষের ভূমিকাকে বড় করে দেখানোর জন্য যে তথ্যগুলি প্রয়োজন, বেছে বেছে ঠিক সেগুলোকেই ব্যবহার করা হয়েছে। আই পি সি সি-র দাবি, তারা নিতান্তই নিরপেক্ষ এবং এ আর ৪-এ যত দূর সম্ভব যথার্থ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। দাবিটি ঠিক নয়। বহু ক্ষেত্রেই গবেষণার ফলাফলকে ইচ্ছাকৃত ভাবে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানো হয়েছে, তাৎপর্যপূর্ণ অনেক তথ্য চেপে যাওয়া হয়েছে এবং বহু প্রাসঙ্গিক গবেষণার কথা উল্লেখই করা হয়নি।

আমাদের গবেষণালব্ধ এই সিদ্ধান্তের পক্ষে অনেকগুলি তথ্যপ্রমাণ আমরা এই বইটিতে পেশ করেছি। এখানে এমন কয়েক হাজার স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্রের কথা আমরা উল্লেখ করেছি, যেগুলির প্রতিপাদ্য আই পি সি সি-র মুখ্য বক্তব্যের ('বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য প্রধানত মানুষই দায়ী, এবং এই উষ্ণায়নের ফল বিধ্বংসী') সম্পূর্ণ বিপরীত।

আমরা প্রথমে আই পি সি সি এবং এন আই পি সি সি সংস্থা দুটির ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করব। এই আলোচনাটি জরুরি, কারণ কেন দুটি সংস্থা একই তথ্য ব্যবহার করে পরস্পরবিরোধী দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে, তা বোঝার জন্য সংস্থা দুটির ইতিহাস সম্বন্ধে অন্তত একটি প্রাথমিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। এর পর আমরা অ্যাপেনডিক্স ৪-এ উল্লিখিত ৩১, ৪৭৮ জন মার্কিন গবেষকের নাম উল্লেখের কারণ আলোচনা করব। শেষ পর্বে আমরা বলব, আমাদের এই রিপোর্টটি কী উদ্দেশ্যে রচনা করা হয়েছে।

আই পি সি সি-র সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতনতা ১৯৭০-এর দশক থেকেই বাড়তে আরম্ভ করে। এই সচেতনতা বৃদ্ধির কেন্দ্রে ছিল বেশ কয়েকটি 'বিপর্যয়'—বিভিন্ন রাসায়নিকের প্রভাবে ক্যানসারের মহামারীর আকার ধারণ করা, কীটনাশক ব্যবহারের ফলে বেশ কিছু প্রজাতির পাখি এবং অন্যান্য প্রাণী বিলুপ্ত হওয়া; প্রথমে সুপারসোনিক বিমান এবং পরে ফ্রিয়নের দৌলতে ওজোন স্তরের ক্ষতি হওয়া, অ্যাসিড বৃষ্টির ফলে অরণ্য নষ্ট হওয়া; এবং অবশ্যই শেষ পাতে বিশ্ব উষ্ণায়ন। প্রয়াত আরন ওয়াইল্ডভস্কি বিশ্ব-উষ্ণায়নকে বলেছিলেন 'সব পরিবেশ-আতঙ্কের মা'!

আই পি সি সি-র ঐতিহাসিক উৎস সন্ধান করলে বেশ কয়েকটি মাইলফলক চিহ্নিত করা সম্ভব—১৯৭০ সালের ওয়ার্ল্ড আর্থ ডে, ১৯৭১-৭২-এর স্টকহোম কনফারেন্স, এবং ১৯৮০ ও ১৯৮৫-র ভিলাচ কনফারেন্স। ১৯৮৬ সালের জুলাই মাসে ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনএমন্ট প্রোগ্রাম (ইউ এন ই পি) এবং ওয়ার্ল্ড মেটিওরোলজিকাল অরগানাইজেশন রাষ্ট্রপুঞ্জের একটি শাখা সংগঠন হিসেবে 'ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ' (আই পি সি সি) প্রতিষ্ঠা করে।

মনে রাখা প্রয়োজন, আই পি সি সি-তে যাঁরা মুখ্য দায়িত্বে ছিলেন, যাঁরা রিপোর্ট লেখার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই নির্বাচন করত সরকার, এবং সংস্থাটি যে সামারিজ ফর পলিসিমেকারস (এস পি এম) তৈরি করত, তা-ও রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য দেশগুলির সরকারকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিতে হয়েছিল। আই পি সি সি-র সঙ্গে যে বিজ্ঞানীরা যুক্ত ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকের বেতনই আসত সরকারি কোষাগার থেকে। এবং, এই বেতন শুধু তাঁদের গবেষণার জন্য নয়, তাঁরা আই পি সি সি-তে যে কাজ করতেন, তার জন্যও বটে। যাঁরা আই পি সি সি-র রিপোর্ট লেখেন, তাঁরা দারুণ দারুণ সব জায়গায় বেড়াতে যান। যাতায়াতের খরচ, হোটেল ভাড়া সবই সরকার জোগায়।

আই পি সি সি-র ইতিহাস নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। যে কথাটা কখনও স্পষ্ট করে বলা হয়নি, তা হল, সংগঠনটি তার জন্মমুহূর্ত থেকেই চরিত্রগত ভাবে অ্যাকটিভিস্ট। গোড়া থেকেই সংস্থাটির লক্ষ্য ছিল, গ্রিনহাউস গ্যাস, বিশেষত কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃহরণ কমানোর যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করা। তার ফলেই, সংস্থাটির রিপোর্টগুলিও শুধুমাত্র সেই তথ্যপ্রমাণগুলিরই সন্ধান করেছে, যেগুলো দিয়ে প্রমাণ করা যায়, মানুষের জন্যই বিশ্ব উষ্ণায়ন ঘটছে। আই পি সি সি-র ঘোষিত কর্তব্যই হল, 'একটি বিস্তারিত ও সম্পূর্ণ, বস্তুমুখী, খোলা এবং স্বচ্ছ ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে মানুষের কাজকর্মের ফলে হওয়া জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদ, তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রভাব এবং সেই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার (অ্যাডাপ্টেশন) এবং সেই বিপদকে প্রতিহত করার (মিটিগেশন) পন্থা বিষয়ে সারা পৃথিবীতে যে সাম্প্রতিকতম বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত এবং আর্থ-সামাজিক গবেষণাপত্র প্রকাশিত হচ্ছে, তার পর্যালোচনা করা'। (নজরটান নিজস্ব) [আই পি সি সি ২০০৮]

আই পি সি সি-র তিন প্রধানতম প্রবক্তা হলেন: ১) প্রয়াত অধ্যাপক বার্ট বোলিন (স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব আবহাওয়াবিদ); ২) ডক্টর রবার্ট ওয়াটসন (প্রথমে নাসা এবং পরবর্তী কালে বিশ্ব ব্যাঙ্কের অ্যাটমোসফিয়ারিক কেমিস্ট এবং বর্তমান ব্রিটেনের ডিপার্টমেন্ট অব এনভায়রনমেন্ট, ফুড অ্যান্ড রুরাল অ্যাফেয়ার্স-এর চিফ সায়েন্টিস্ট); এবং ৩) ডক্টর জন হাউস্টন হিসেবে ব্রিটেনের আবহাওয়া দফতরের প্রধান)।

বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরের ওপর মানুষের কাজকর্মের কী প্রভাব পড়েছে, তা দেখার জন্য ওয়াটসন একটি গোষ্ঠী তৈরি করেন এবং নিজেই তাঁর চেয়ারম্যান হন। ক্লোরোফ্লুরোকার্বন (সিএফ সি) নিঃসরণের ওপর নিয়ন্ত্রণ তৈরি করার জন্য ১৯৮৭ সালের মন্ট্রিওল

প্রোটোকল রচনা করার ক্ষেত্রেও প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ওয়াটসন। মন্ট্রিওল প্রোটোকলের ব্লুপ্রিন্ট ব্যবহার করেই ন্যাচারাল রিসোর্সেস ডিফেন্স কাউন্সিলের পরিবেশ-আইনজীবী ডেভিড ডোনিগার গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের ওপরও একই ধরনের নিয়ন্ত্রণ আরোপের পরিকল্পনা রচনা করেন। এই পরিকল্পনাটিই শেষ পর্যন্ত কিয়োটো প্রোটোকল হিসেবে গৃহীত হয়।

একেবারে গোড়া থেকেই আই পি সি সি একটি বৈজ্ঞানিক সংস্থা না হয়ে রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হয়েছে। সংস্থাটির প্রধান বিজ্ঞানীরা হয় তাঁদের দেশের সরকারের অবস্থানের ধুয়ো ধরেছেন, অথবা দেশের সরকার যাতে আই পি সি সি-র অবস্থানের সঙ্গে সুর মেলায়, সেই চেষ্টা করে গিয়েছেন। যে কথাটি বিশেষ করে উল্লেখ করা প্রয়োজন, তা হল, মুষ্টিমেয় কিছু অ্যাকটিভিস্টের একটি দল আই পি সি সি-র চারটি অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টের প্রত্যেকটির মহ গুরুত্বপূর্ণ সামারি ফর পলিসিমেকারস রচনা করেছেন। (ম্যাককিট্রিক ও অন্যান্য, ২০০৭)

বারে বারেই বলা হয়ে থাকে, আই পি সি সি-র রিপোর্ট হাজার হাজার বিজ্ঞানীর গবিষণালব্ধ ফলের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। আসলে, আই পি সি সি কী সিদ্ধান্তে পৌঁছোবে, সে বিষয়ে এই বিজ্ঞানীদের সিংহভাগেরই কোনও প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ থাকে না। সামারি ফর পলিসিমিকারস রচনা করেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিজ্ঞানী, এবং সেই রিপোর্টের প্রতিটি বাক্য রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য দেশগুলির প্রতিনিধিদের দ্বারা অনুমোদন করিয়ে নিতে হয়। কোনও প্রকৃত বৈজ্ঞানিক রিপোর্ট যে এ ভাবে লেখা হয় না বা এ ভাবে প্রকাশিত হয় না, সে কথাটি নিশ্চয়ই আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, সামারি ফর পলিসিমেকারস নামক সংক্ষিপ্ত নথিটি আসলে অসম্ভব বড় এবং কার্যত অপাঠ্য বৈজ্ঞানিক রিপোর্টের থেকে খুবই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে বেছে নেওয়া অংশবিশেষ। আই পি সি সি-র যে চারটি অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টের কথা বলছি, তার প্রতিটিই মোটামুটি ৮০০ পাতার, শেষেরটি ছাড়া কোনওটিতেই ইনডেক্স নেই, এবং খুব নিষ্ঠাবান বিজ্ঞানী ছাড়া কারও সাধ্য নেই যে রিপোর্টগুলি পড়ে উঠতে পারেন।

আই পি সি সি-র প্রথম অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট (আই পি সি সি-এফ এ আর, ১৯৯০)-এর সিদ্ধান্ত ছিল, ভূপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রায় যে বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গিয়েছে, তার সঙ্গে গ্রিনহাউস মডেলের 'মোটামুটি সাযুজ্য' রয়েছে। কোনও বিস্তারিত বিশ্লেষণ ছাড়াই রিপোর্টটি জানিয়ে দিল, বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ দ্বিগুণ হলে গড় তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়বে (পরিভাষায় একে ক্লাইমেট সেনসিটিভিটি বলা হয়)। আই পি সি সি-এফ এ আর-এর ফলেই ১৯৯২ সালে রিও ডি জেনেইরো-র আর্থ সামিটে গ্লোবাল ক্লাইমেট ট্রিটি গৃহীত হয়।

আই পি সি সি-র প্রথম অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টটির বেশ কিছু সমালোচনা হয় (এস ই পি সি ১৯৯২)। নেচার পত্রিকার দুটি সম্পাদকীয়তেও এফ এ আর এবং আই পি সি সি-র কাজের ধরনের সমালোচনা করা হয় (অজ্ঞাত ১৯৯৪, ম্যাডক্স ১৯৯১)।

আই পি সি সি-র দ্বিতীয় অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট (আই পি সি সি-এস এ আর, ১৯৯৫) তৈরি হয় ১৯৯৫ সালে, এবং প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালে। এই রিপোর্টের সামারি ফর পলিসিমেকারস-এর উপসংহারটি স্মরণীয়: "বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণের ভারসাম্য থেকে এই কথাটি স্পষ্ট যে বিশ্বের পরিবেশের ওপর মানুষের কাজকর্মের বিশেষ প্রভাব আছে"। এই দ্বিতীয় অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টটিরও প্রভূত সমালোচনা হয়। এ বারের সমালোচনার কারণ, যে বিজ্ঞানীরা এই রিপোর্টটি রচনা করেছিলেন, তাঁরা শেষ বার দেখে রিপোর্টটিকে অনুমোদন করার পর তাতে বিস্তর পরিবর্তন করা হয়, যাতে রিপোর্টের বক্তব্য সামারি ফর পলিসিমেকারস-এর সঙ্গে মেলে। রিপোর্টটি যে শুধু বদলানো হয়েছিল তা-ই নয়, বিশ্ব উষ্ণায়নের পিছনে মানুষের ভূমিকাকে বড় করে দেখাতে একটা তাৎপর্যপূর্ণ গ্রাফও বানিয়ে ফেলা হয়েছিল। সামারি ফর পলিসিমেকারস-এর সপক্ষে খাড়া করার জন্য রিপোর্টে যে সব 'প্রমাণ' দেওয়া হয়েছিল, দেখা গেল সেগুলো আদ্যন্ত ভেজাল।

রিপোর্টর মূল ভাষ্যে এই যে পরিবর্তন করা হয়েছিল, সে বিষয়ে বিস্তারিত লেখালেখি হয়েছে। তার মধ্যে একটি হল ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে লেখা ডক্টর ফ্রেডরিক সিটজ-এর একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ (সিটজ, ১৯৯৬)। এই লেখালেখির ফলে এক উত্তপ্ত বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এক দিকে ছিলেন আই পি সি সি-র সমর্থকরা, আর অন্য দিকে ছিলেন তাঁরা, যাঁরা রিপোর্টর ভাষ্য এবং গ্রাফের পরিবর্তন বিষয়ে সম্যক ভাবে অবহিত ছিলেন। এই বিতর্কেরই একটা অংশ হল *বুলেটিন অব দ্য অ্যামেরিকান মেটিওরোলজিকাল সোসাইটি*-তে চিঠি চালাচালি (সিঙ্গার ও অন্যান্য, ১৯৯৭)।

আই পি সি সি-র দ্বিতীয় অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টর প্রত্যুত্তরেই ১৯৯৬ সালে এস ই পি পি তাদের লিপজিগ ডিক্লেয়ারেশন প্রকাশ করে। এই নথিটিতে একশোরও বেশি পরিবেশ বিজ্ঞানী স্বাক্ষর করেন। এর পরেই ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দ্য সায়েন্টিফিক কেস এগেনস্ট দ্য গ্লোবাল ক্লাইমেট ট্রিটি নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকাটি বহু ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। (এস ই পি পি, ১৯৯৭। প্রতিটি নথিই www.sepp.org ওয়েবসাইটটিতে পাওয়া যাবে।) দ্বিতীয় অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টের এই ভ্রান্তিগুলি সত্ত্বেও এই রিপোর্টটিই কেয়োটো প্রোটোকলের ভিত্তি রচনা করে। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কিয়োটো প্রোটোকল গৃহীত হয়। এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে হোভার ইনস্টিটিউশন প্রকাশিত ক্লাইমেট পলিসি—ফ্রম রিও টু কিয়োটো নামক পুস্তিকাটিতে (সিঙ্গার, ২০০০)।

আই পি সি সি-র তৃতীয় অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট (আই পি সি সি-টি এ আর, ২০০১) ২০০১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এই রিপোর্টটি এক বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল—রিপোর্টের সামারি ফর পলিসিমেকারস অংশটির বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করতে নকল, ভেজাল 'বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র' ব্যবহার করার জন্য। সামারি ফর পলিসিমেকারস-এর বক্তব্য ছিল, বিশ্ব-উষ্ণায়ন যে মানুষের কারণেই হচ্ছে, তার 'নতুন এবং দৃঢ়তর প্রমাণ' পাওয়া গিয়েছে। এই ভেজাল গবেষণাপত্রগুলোর একটা ছিল তথাকথিত 'হকি স্টিক' পেপার। এই গবেষণাপত্রটিতে প্রক্সি ডেটা বিশ্লেষণ করা হয়েছিল, এবং দাবি করা হয়েছিল, বিংশ শতাব্দীই নাকি গত এক হাজার বছরের মধ্যে উষ্ণতম দশক। পরবর্তী কালে দেখা গেল, এই গবেষণাপত্রটির একেবারে গোড়ায় গলদ—তার সংখ্যাতত্ত্বের বিশ্লেষণেই ভুল (ম্যাকইন্টাইর ও ম্যাককিট্রিক, ২০০৩, ২০০৫; ওয়েগম্যান ও অন্যান্য, ২০০৬)। আই পি সি সি আরও একটি গবেষণাপত্রকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। সেই গবেষণাপত্রটির দাবি ছিল, ১৯৪০-এর আগে যে উষ্ণায়ন ঘটেছে, তার জন্যও মানুষ দায়ী, এবং সেই উষ্ণায়নের প্রধান কারণ গ্রিনহাউস গ্যাস। পরবর্তী কালে দেখা গেল, এই গবেষণাপত্রটিতেও সেই এক ভুল—সংখ্যাতত্ত্বের বিশ্লেষণে একেবারে প্রাথমিক প্রমাদ। আই পি সি সি-র তৃতীয় অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টের প্রত্যুত্তরে এস ই পি পি ২০০২ সালে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। তার নাম দ্য কিয়োটো প্রোটোকল ইজ নট ব্যকড বাই সায়েন্স (এস ই পি পি, ২০০২)।

আই পি পি সি-র চতুর্থ অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ২০০৭ সালে। রিপোর্টটির নাম আই পি সি সি-এ আর ৪, ২০০৭। ওয়ার্কিং গ্রুপ ওয়ান-এর সামারি ফর পলিসিমেকারস প্রকাশিত হয় ফ্রেব্রুয়ারি মাসে। মূল রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় মে মাসে, সামারি ফর পলিসিমেকারস-এর বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের পর। এটা লক্ষণীয় যে চতুর্থ অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টে কিন্তু আর 'হকি স্টিক' পেপার বা ১৯৪০-এর আগেকার উষ্ণায়নের মানুষের ভূমিকা সম্বন্ধে যে গবেষণাপত্র, সেগুলোর আর কোনও ব্যবহার নেই। এই রিপোর্টটি নিয়েও যথারীতি বিতর্ক সৃষ্টি হয়। এ বারের বিতর্কের কারণ অবশ্য কিঞ্চিৎ আলাদা। আই পি সি সি জানিয়ে দেয়, রিপোর্টটির সম্বন্ধে গবেষকরা যে মন্তব্য করেছেন (পরিভাষায় যাকে বলে পিয়ার রিভিউ), তা প্রকাশ করা হবে না। তার পর আই পি সি সি এই মন্তব্যগুলিকে বইয়ের আকারে বাঁধিয়ে এক লাইব্রেরিতে পাঠিয়ে দেয়। সেই লাইব্রেরিটি আবার তখন সংস্কারকার্যের জন্য বন্ধ ছিল। প্রবল চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত আই পি সি সি এই পিয়ার রিভিউগুলি অনলাইনে প্রকাশ করতে বাধ্য হয়। দেখা যায়, রিপোর্টের যে অধ্যায়ে বিশ্ব-উষ্ণায়নের দায় মানুষের ওপর চাপানো হয়েছে, সেই অধ্যায়ে সম্বন্ধে রিভিউয়ার বিজ্ঞানীরা যে মন্তব্য করেছেন, চূড়ান্ত রিপোর্টটি লেখার সময় আই পি সি সি-র লেখকরা সেই মন্তব্যের অর্ধেকেরও বেশি সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন।

আই পি সি সি-র চতুর্থ অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল, সেটি এই: 'বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রার যে বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গিয়েছে, তা খুব সম্ভবত মানুষের কাজকর্মের ফলে তৈরি গ্রিনহাউস গ্যাসের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার ফলেই ঘটেছে'। (নজরটান নিজস্ব) বর্তমান গবেষণাপত্রটিতে আমরা দেখাব, আই পি সি সি এই বক্তব্যটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য দুটো কাজ করেছিল—এক, মানুষের কাজকর্মের ফলে গ্রিনহাউস গ্যাসের ঘনত্ব বেড়েছে, এই তত্ত্বটির বিপক্ষে যে তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, সেগুলিকে চেপে দিয়েছে; দুই, পরিবেশের ওপর সৌরমণ্ডলের বিভিন্ন পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে সম্প্রতি যে গবেষণাগুলি হচ্ছে, সেগুলির অস্তিত্বও স্বীকার করেনি।

একটি প্রশ্ন এখানে অনিবার্য হয়ে ওঠে: আই পি সি সি-র প্রত্যেকটি রিপোর্ট নিয়েই কেন এত বিতর্ক হয়েছে? কেন বার বার বিভিন্ন গবেষক আই পি সি সি-র রিপোর্টের বিপ্রতীপ অবস্থান নিয়েছেন, সেই রিপোর্ট নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন? জলবায়ু পরিবর্তনের পিছনে মানুষের অবদান খুঁজে বের করার যে পণ এই সংস্থাটি তার জন্মলগ্ন থেকে করেছে, সেই পণটি এই ব্যাপক সমালোচনার একটা বড় কারণ। আর একটি কারণ হল, একটি সরকারি সংস্থা হিসেবে আই পি সি সি বিভিন্ন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় বা হতে পারে। তৃতীয় কারণটি অর্থনৈতিক। যে বিজ্ঞানী বা আমলারা আই পি সি সি-র মতের সঙ্গে মিলিয়ে রিপোর্ট তৈরি করার জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফলকেও প্রয়োজন মতো ছেঁটেকেটে নিতে দ্বিধা করেন না, তাঁদের জন্য বিপুল আর্থিক এবং পেশাদারি পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকে।

আই পি সি সি-র রিপোর্টের বিশ্বাসযোগ্যতার অভাবের আরও একটি কারণ, সর্বোচ্চ স্তরের নীতি নির্ধারকদের কোনও এক অজ্ঞাত কারণে ধারণা হয়েছে, কোনও একটি গবেষণাপত্র 'পিয়ার রিভিউড' অর্থাৎ অন্য বিজ্ঞানীদের দ্বারা পঠিত হলেই তা নির্ভুল। বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায়, অনেক পরিবেশ সংক্রান্ত গবেষণাপত্রই যাঁদের কাছে পিয়ার রিভিউয়ের জন্য পাঠানো হয়েছে, সেটা যথেষ্ট নয়। কিন্তু, তবুও এটাই হয়ে চলে, কারণ গবেষণাপত্রের লেখকের সমমনস্ক কতিপয় বিজ্ঞানীই পিয়ার রিভিউ করার দায়িত্ব পান (ওয়েগম্যান ও অন্যান্য, ২০০৬)। নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে পরীক্ষিত বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করাই শ্রেয় এবং বিধেয়। কোনও একটি গবেষণাপত্র পিয়ার রিভিউড হয়েছে, অতএব সেটি বিশ্বাসযোগ্য এবং তার সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণযোগ্য—এই সরল (এবং, অধিকাংশ সময়েই ভ্রান্ত) বিশ্বাসের ওপর নির্ভর না করাই উচিত।

ননগভর্নমেন্টাল ইন্টারন্যাশনাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ

যখন দেখা গেল, আই পি সি সি-র চতুর্থ অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টটিও

ভুল এবং মিথ্যেয় ভর্তি, তখন এস ই পি পি একটি 'টিম বি' তৈরি করল। আই পি সি সি তার রিপোর্ট তৈরি করার জন্য যে তথ্য ব্যবহার করেছে, এই টিমটির দায়িত্ব হল সেই তথ্যগুলিকেই স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ ভাবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পুনর্মূল্যায়ন করা। সংগঠনটি প্রাথমিক ভাবে তৈরি হয় মিলান-এ একটি বৈঠকে, ২০০৩ সালে। কিন্তু, ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আই পি সি সি-এ আর ৪-এর সামারি ফর পলিসিমেকারস প্রকাশিত হওয়ার পরেই টিম বি-র কাজ আরম্ভ করা হয়। সংগঠনটি নিজের নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম ননগভর্নমেন্টাল ইন্টারন্যাশনাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ গ্রহণ করে, এবং ২০০৭ সালের এপ্রিলে ভিয়েনায় একটি আন্তর্জাতিক পরিবেশ কর্মশালার আয়োজন করে।

বর্তমান রিপোর্টটির সূচনা সেই ভিয়েনা কর্মশালাতেই। সেই কর্মশালার পরবর্তী পর্যায়ে যে বিভিন্ন গবেষণা হয়েছে, তা এই রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত। আন্তর্জাতিক গবেষকদের বৃহত্তর গোষ্ঠীর কাজও এই রিপোর্টের অংশ। যে বিজ্ঞানীদের কাজ এই রিপোর্টে গ্রহণ করা হয়েছে, পৃষ্ঠা ii-এ তাঁদের নামের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। এই রিপোর্টে ক্রেগ ইডসো-র একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। তিনি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক রিভিউয়ের একটি বৃহৎ সংকলন সংগ্রহ করেন এবং নিজেও লেখেন। সম্পূর্ণ সংকলনটি দ্য সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব কার্বন ডাই অক্সাইড অ্যান্ড গ্লোবাল চেঞ্জ-এর ওয়েবসাইট www.CO^{2}science.org-এ দেখা যেতে পারে। ২০০৮ সালে দ্য হার্টল্যান্ড ইনস্টিটিউট এস ফ্রেড সিঙ্গার-এর সম্পাদিত সামারি ফর পলিসিমেকারস *নেচার, নট হিউম্যান অ্যাকটিভিটি, রুলস দ্য প্ল্যানেট* (সিঙ্গার, ২০০৮) প্রকাশ করে। এই নথিটি এন আই পি সি সি-র সম্পূর্ণ রিপোর্টটির কাজ শেষ হওয়ার আগেই প্রকাশিত হয়, এবং নথিটি প্রকাশিত হওয়ার পরে সংস্থার গবেষণার কাজে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্দন সাধিত হয়। ফলে, এখন এই দুটি নথি দুটি পৃথক গবেষণা পত্র হিসেবে স্বীকৃত, এবং দুটি নথির মূল বক্তব্য পরস্পরের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ।

আমাদের এই গবেষণার কাজে প্রেরণা কী ছিল? আর্থিক স্বার্থ ছিল না। এই রিপোর্টটি লেখার জন্য কাউকে কোনও আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়নি, তেমন প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়নি। একমাত্র ব্যতিক্রম ক্রেগ ইডসো। তাঁর বিপুল সংকলনটির লেখা জোগাড় করার জন্য এবং শেষ পর্যন্ত তা প্রকাশ করার জন্য যে বিপুল শ্রম এবং সময় ব্যয় করতে হয়েছে, তার জন্য আর্থিক অনুদান ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না। আমাদের কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল না। কোনও দেশের সরকারই আমাদের এই কাজটি করতে বলেনি, আমাদের কাজকে সরকারি স্বীকৃতিও দেয়নি। আমরাও কোনও রাজনৈতিক দলের বা ব্যক্তির হয়ে কাজ করি না, কাউকে রাজনৈতিক সমর্থনও জোগাই না।

আমাদের এই কাজে নিজেদের সময় এবং শ্রম দেওয়ার কারণটি ভিন্ন। আমরা এক গভীর উদ্বেগের জায়গা থেকে এই কাজে হাত দিয়েছি। আমরা বিশ্বাস করি, আই পি সি সি কিছু অসম্পূর্ণ, ভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সাহায্য নিয়ে মানুষের সৃষ্টি করা বিশ্ব উষ্ণায়ন সম্পর্কে অহেতুক ভীতির সৃষ্টি করছে। বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে যে অহেতুক হইচই আরম্ভ হয়েছে, তার কুপ্রভাব অসংখ্য— গাড়ির নিঃসরণের ক্ষেত্রে এক অবাস্তব সীমা ধার্য করা হয়েছে, নিতান্ত অকুশলী সৌর এবং বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে, ভুট্টা থেকে ইথানলের মতো অর্থনৈতিক ভাবে অকুশলী জৈব জ্বালানি তৈরি করার জন্য বিপুল ব্যয়ে পরিকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে, বিদ্যুৎ সংস্থাগুলির কাছে দাবি করা হচ্ছে যাতে তারা অনেক বেশি অর্থ ব্যয় করে তথাকথিত পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ কেনে, এবং বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যে কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসৃত হয়, তাকে আটক করার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে, অবশ্যই বিপুল অর্থ ব্যয় করে। জ্বালানির কুশলতা বৃদ্ধির চেষ্টায় অথবা শক্তির বৈচিত্রায়নের চেষ্টায় নিঃসন্দেহে কোনও দোষ নেই। কিন্তু, এই কাজগুলিকে পরিবেশ রক্ষার পক্ষে অবশ্যকর্তব্য বলে চালানোর চেষ্টা করাটা দোষের। ক্যাপ অ্যান্ড ট্রেড, স্বচ্ছ জ্বালানি, কার্বন অফসেট ইত্যাদি যে পন্থাগুলি গ্রিনহাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বাজারে আনা হয়েছে, যেগুলি বৃহত্তর জনসমাজের স্বার্থ বির্সন দিয়ে মুষ্টিমেয় কিছু লোকের পকেট ভরে চলেছে, সেগুলির লুকোনো খরচকে বিজ্ঞানের তত্ত্ব দিয়ে যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ করা যায় না।

আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করেছি যে বিজ্ঞানকে অপব্যবহার করে সরকারি নীতির একটি নতুন গতিপথ তৈরির চেষ্টা চলছে। এই গতিপথটি যে, বিশেষত স্বল্প আয়ের মানুষদের পক্ষে, অর্থনৈতিক ভাবে অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে, সে সম্ভাবনা আছে। যা আরও সমস্যার, তা হল, একমাত্র বিজ্ঞানী-সমাজের অন্দরমহলের বাইরে আর কারও প্রায় ধারণাই নেই যে বাস্তবে কী ঘটছে, এবং, যে বিজ্ঞানীরা প্রকৃত সত্যটি জানেন, তাঁদের মধ্যেও বেশির ভাগেরই আই পি সি সি-র বিরুদ্ধে কথা বলার ইচ্ছে বা সুযোগ নেই। আমাদের মনে হয়েছে, এই সময়ে বিজ্ঞানের পক্ষে কথা বলা প্রয়োজন। আমরা সেই দায়িত্বটিই পালন করছি।

এন আই পি সি সি সংগঠনটির নাম যা বলে, সংগঠনটি চরিত্রগত ভাবে ঠিক তা-ই। যে অ-সরকারি বিজ্ঞানী এবং গবেষকরা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ও ফলাফলকে সম্যক ভাবে বুঝতে চান, এটি তাঁদের একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন। যেহেতু আমরা গোড়া থেকেই এটা ধরে নিচ্ছি না যে জলবায়ু পরিবর্তন আসলে মানুষের কাজকর্মেরই ফল, তাই আই পি সি সি যে তথ্যপ্রমাণগুলোকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনিনি, আমরা সেগুলোকে পরীক্ষা করে দেখতে পেরেছি। যেহেতু আমরা কোনও সরকারের

হয়ে কাজ করি না, কাজেই আমাদের এই কথাটি বলারও দায় নেই যে এই পরিস্থিতিতে সরকারের আরও বেশি উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন।

দ্য পিটিশন প্রজেক্ট

এই রিপোর্টটির অ্যাপেনডিক্স ৪-এ দ্য পিটিশন প্রজেক্ট-এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে, এবং মোট ৩১,৪৭৮ জন মার্কিন বিজ্ঞানীর নাম রয়েছে, যাঁরা এই বিবৃতিটিতে স্বাক্ষর করেছিলেন:

> আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের নিকট এই মর্মে আবেদন করছি যে ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপানের কিয়োটোয় বিশ্ব উষ্ণায়ন সংক্রান্ত যে চুক্তিটি লিপিবদ্ধ হয়, সেটি এবং তার অনুরূপ অন্য যে কোনও চুক্তি সরকার প্রত্যাখ্যান করুক। গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের ক্ষেত্রে যে ঊর্দ্ধসীমা প্রস্তাব করা হয়েছে, সেটি মান্য করা হলে পরিবেশের ক্ষতি হবে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হবে এবং মানুষের স্বাস্থ্য ও সামাজিক কল্যাণ ব্যাহত হবে। মানুষের নিঃসৃত কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন বা অন্য কোনও গ্রিনহাউস গ্যাস প্রবল হারে উষ্ণায়ন ঘটাচ্ছে এবং পরিবেশের মারাত্মক বিধ্বংসী ক্ষতি করছে, অথবা অদূর ভবিষ্যতে করবে, এমন কথা বলার মতো যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। উপরন্তু, এই কথাটির পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে তা অরণ্য এবং বন্য প্রাণীর জীবনধারণের পরিবেশের পক্ষে ইতিবাচক হবে।

আই পি সি সি-র বক্তব্যের বিরুদ্ধে এটি উল্লেখযোগ্য রকম কড়া বিবৃতি। এন আই পি সি সি এবং বর্তমান রিপোর্টটির সঙ্গে এই আবেদনের বক্তব্যের মিলও স্পষ্ট। আরও একটি তথ্য স্মরণে রাখা প্রয়োজন— আই পি সি সি-র চতুর্থ অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টটি রচনা করতে, তার গবেষণার কাজে, রিপোর্টটির রিভিউয়ে এবং আরও যাবতীয় প্রক্রিয়ায় মোট যত জন বিজ্ঞানী যুক্ত ছিলেন বলে আই পি সি সি দাবি করে, এই আবেদনটিতে তার দশ গুণেরও বেশি বিজ্ঞানী স্বাক্ষর করেছেন। স্বাক্ষরকারী বিজ্ঞানীদের মধ্যে ৯,০২৯ জনের পি এইচ ডি ডিগ্রি রয়েছে। স্বাক্ষরকারীদের প্রত্যেকেই এই আবেদনটির বক্তব্যকে সমর্থন করেন। এ বার উল্টো দিকের কথা ভাবুন। অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট ৪-এর অ্যাপেনডিক্সে মোট একশোরও কম বিজ্ঞানীর (এবং, বিজ্ঞানী নন, এমন কিছু মানুষের) নাম উল্লেখ করা আছে, যাঁরা মহাগুরুত্বপূর্ণ সামারি ফর পলিসিমেকারস রচনার কাজে যুক্ত ছিলেন, বা মূল রিপোর্টটির শেষ সম্পাদনার কাজ, অর্থাৎ রিপোর্টটিকে সামারি ফর পলিসিমেকারস-এর বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলার কাজে যুক্ত ছিলেন। নিশ্চিত করে শুধু এইটুকুই বলা চলে যে এই একশো জনের কম মানুষই আই পি সি সি-র অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট ৪-এর মূল বক্তব্যকে সমর্থন করেন। ভেবে দেখলে, আমাদের বোঝার কোনও উপায় নেই, এই শ'খানেক মানুষের বাইরে গোটা দুনিয়ায় আদৌ কেউ অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট ৪-এর বিরাট বিরাট সব দাবির সঙ্গে সহমত কি না।

আই পি সি সি যে ভুলটি করেছে, আমরা তা করব না। আমরা এই কথা বলব না যে রিপোর্টের শেষে যে ৩১,৪৭৮ জন বিজ্ঞানীর নাম দেওয়া হয়েছে, তাঁরা সবাই এই রিপোর্টের সব বক্তব্য এবং সিদ্ধান্তের সঙ্গে সহমত। এই প্রসঙ্গে এই পিটিশনের রচয়িতাদের বক্তব্য উদ্ধার করা যাক (অ্যাপেনডিক্স ৪-এ স্বাক্ষরকারীদের নামের তালিকার পঞ্জির ভূমিকা থেকে): "স্বাক্ষরকারীরা শুধুমাত্র একটি আবেদনে স্বাক্ষর করেছেন— এই আবেদনটি নিজেই নিজের কথা বলবে"। যাঁরা স্বাক্ষরকারীদের নামের তালিকাটির তত্ত্বাবধান করেন, আমরা তাঁদের অনুমতিসাপেক্ষে তালিকাটি এখানে প্রকাশ করলাম। উদ্দেশ্যটি স্পষ্ট: এই রিপোর্টের বক্তব্যের প্রতি বৃহত্তর বৈজ্ঞানিক সমাজের যে সমর্থন রয়েছে, আমরা তা প্রকাশ করতে চেয়েছি, এবং আই পি সি সি-র সঙ্গে এন আই পি সি সি-র একটি মৌলিক পার্থক্য স্পষ্ট করে দিতে চেয়েছি।

দ্য পিটিশন প্রজেক্ট সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত জানতে চাইলে, অথবা এই প্রকল্পটির সমর্থনে ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স-এর ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট ও রকফেলার ইউনিভার্সিটির ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট ইমেরিটাস প্রয়াত ডক্টর ফ্রেডরিক সিটজ যে চিঠিটি লেখেন, সেটি পড়তে চাইলে অ্যাপেনডিক্স ৪ দেখুন অথবা এই প্রজেক্টের ওয়েবসাইট www.petitionproject.org দেখুন।

ভবিষ্যতের দিকে

মানুষের সৃষ্টি করা বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে মূলধারার সংবাদমাধ্যমগুলি বিসদৃশ রকম বাড়াবাড়ি করেছে। কিন্তু, তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের মনে এই অহেতুক আতঙ্কটির প্রভাব ক্রমে কমছে। মানুষের ভয় তার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল, এ বার তা কমতে বাধ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের মাত্র ৩৪ শতাংশ মনে করেন, বিশ্ব উষ্ণায়ন মানুষের তৈরি করা (রাসমুসেন রিপোর্টস, ২০০৯)। প্রকৃতই উষ্ণায়ন ঘটছে, এই কথাটিতে বিশ্বাস করেন, এমন মানুষের সংখ্যাও ক্রমে কমছে (পিউ রিসার্চ সেন্টার, ২০০৮)। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থা এইচ এস বি সি এবং বিভিন্ন পরিবেশবাদী গোষ্ঠী ১১টি দেশের মোট ১২,০০০ মানুষকে নিয়ে একটি সমীক্ষা করে। সেই সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, প্রতি পাঁচ জন মানুষের মধ্যে এক জন, অর্থাৎ মাত্র কুড়ি শতাংশ মানুষ বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করতে তাঁরা কিছুমাত্র বাড়তি খরচ করতে প্রস্তুত। এক বছর আগেও এই দলে ২৮ শতাংশ মানুষ ছিলেন (ও'নিল, ২০০৮)।

বর্তমান রিপোর্টটিতে স্পষ্ট যে বিজ্ঞানীদের বিতর্কে বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে বাড়াবাড়ি করার পক্ষে লোকের সংখ্যা ক্রমে কমছে।

এটা লক্ষ্য করে ভাল লাগছে যে রাজনীতির বিতর্কটিও শেষ হয়ে যায়নি। নীতিনির্ধারকদের মধ্যে যাঁরা বিশ্ব উষ্ণায়নের বিষয়টি নিয়ে সন্দিহান, তাঁদের মধ্যে আছেন চেক রিপাবলিক-এর প্রেসিডেন্ট এবং ২০০৯ সালে কাউন্সিল অব দ্য ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ভাকলাভ ক্লাউস, জার্মানির প্রাক্তন চ্যান্সেলর হেলমুট শ্মিডট, ব্রিটেনের প্রাক্তন চ্যান্সেলর অব এক্সচেকার লর্ড নাইজেল লসন। এই কথাটি মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে গোটা দুনিয়াতেই নীতিনির্ধারকরা গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণে আইন প্রণয়নের যুক্তিগ্রাহ্যতাকে পুনর্বিবেচনা করছেন।

এ কথা ভেবে খারাপ লাগে যে এক সময় যাঁরা পরিবেশবিতর্কের অত্যন্ত সক্রিয় অংশী ছিলেন, তাঁদের অনেকেই আজ বিজ্ঞানের বিতর্ক বাদ দিয়ে শুধু ব্যক্তিগত আক্রমণ আর কাদা ছোড়াছুড়িতে নেমেছেন। আমাদের ধারণা, এটা তাঁদের হতাশার প্রকাশ। এবং, এর থেকেই স্পষ্ট, বিতর্কের পাল্লা এখন পরিবেশ-বাস্তবতার দিকে ভারী।

আমরা আশা করি, বর্তমান রিপোর্টটি পরিবেশ-বিতর্কে যুক্তি এবং বিবেচনাবোধের সঞ্চার করবে, এবং বিতর্কটিতে একটি ভারসাম্য আনবে। এবং, আমাদের আশা, এ মাধ্যমেই রিপোর্টটি দুনিয়ার বিপুল সংখ্যক মানুষকে কিছু অবাস্তব, অপ্রয়োজনীয় এবং অপচায়কারী শক্তি নীতি এবং পরিবেশ নীতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে। এই রিপোর্টে আমরা যে বিশ্লেষণ করেছি এবং যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, তার সপক্ষে দাঁড়ানোর জন্য আমরা প্রস্তুত এবং যে নীতিনির্ধারকরা প্রকৃতই খোলা মনে এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আরও পরামর্শ চাইবেন, তাঁদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে আমরা তৈরি।

এস ফ্রেড সিঙ্গার, পি এইচ ডি

প্রেসিডেন্ট, সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল পলিসি প্রজেক্ট

প্রফেসর, ইমেরিটাস অব এনভায়নমেন্টাল সায়েন্সেস, ইউনিভার্সিটি অব ভার্জিনিয়া

www.sepp.org

ক্রেগ ডি ইসভো, পি এইচ ডি

চেয়ারম্যান, সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব কার্বন ডাই অক্সাইড অ্যান্ড গ্লোবাল চেঞ্জ

www.co^{2}science.org

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: এই রিপোর্টের সম্পাদকদ্বয় দ্য হার্টল্যান্ড ইনস্টিটিউটের জোসেফ এবং ডায়ান বাস্টকে তাঁদের সম্পাদনার দক্ষতার জন্য এবং আর ওয়ারেন অ্যান্ডারসনকে তাঁর কারিগরী সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছেন **উ মা**

www.heartland.org

পরের অংশ আগামী সংখ্যায়

'আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান তুমি জানো নাই, তুমি জানো নাই, তার মূল্যের পরিমাণ'

হ্যাঁ, শর্মিলা, আমাদের বন্ধু শর্মিলা শরীরের নব্বই শতাংশ দগ্ধ হয়ে যাওয়া অবস্থায় মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একেবারে চলে যাওয়ার আগের দিন হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে গেয়ে উঠেছিল, 'আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান'। এই শর্মিলা গত ১০ই জুন ২০১১ হঠাৎই এক দুর্ঘটনায় নিজের বাড়িতেই আসুনে পুড়ে গিয়েছিল। বাঁচার প্রবল ইচ্ছা আর প্রচণ্ড জীবনীশক্তি দিয়ে ২৩ দিন ধরে লড়াই চালিয়ে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কাছে ওকে হার স্বীকার করতেই হল। ৩রা জুলাই দুপুর ২টো ১০ মিনিটে চলে গেল শর্মিলা।

গণবিজ্ঞান আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ও একনিষ্ঠ কর্মী শর্মিলাকে প্রথম দেখেছিলাম ১৯৮৬ সালে বর্ধমানে বিজ্ঞান যাত্রা করতে গিয়ে। নামটা আগেই শোনা ছিল, উৎস মানুষে লিখত বলে লেখার সঙ্গেও পরিচয় ছিল। কিন্তু চাক্ষুষ পরিচয় হয় নি। বি প্রেমানন্দকে সঙ্গে নিয়ে বর্ধমানে বিজ্ঞান যাত্রা করতে গিয়ে আলাপ হল শর্মিলার সহেগ। তখন থেকেই তৈরি হল বন্ধুত্ব। দূরত্বের কারণে নিয়মিত দেখাসাক্ষাত হতো না, যোগাযোগের মাধ্যম ছিল ফোন। বিভিন্ন জমায়েত ও সভা সমিতিতে দেখা হলেই এক মুখ হাসি নিয়ে এগিয়ে আসত হাসিখুশি প্রাণোচ্ছল শর্মিলা। যে কোনো সামাজিক সমস্যা ওকে ভাবাতো। মানুষের মধ্যে অন্ধ বিশ্বাস আর কুসংস্কার থেকে শুরু করে সমাজে নারীর অমর্যাদা এ সবই ছিল ওর ভাবনার বিষয়। আর শুধু ভাবনাই নয় প্রতিবাদ ও প্রতিকারের জন্য ও লেখালিখিও করত বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়। এক সময়ে 'উৎস মানুষ' পত্রিকার নিয়মিত লেখিকা ছিল শর্মিলা। আমার জানা শর্মিলা এই পর্যন্তই।

গত ১৬ই জুলাই শর্মিলার স্মরণ সভায় গিয়ে ওর অগনিত বন্ধুদের মুখে স্মৃতিচারণা শুনতে শুনেত জানলাম আমি ওকে বা ওর কাজকর্ম সম্পর্কে যতটা জানি তার থেকে অ-নেক বড় পরিধির মধ্যে কাজ করত শর্মিলা। শিক্ষকতা ছিল জীবিকা। সেই কাজের মধ্যেও ছিল নিষ্ঠা ও দরদ। সহকর্মী ছাত্রীদের নানান সমস্যার সমাধান করার জন্য দরকার হত শর্মিলাদির। শ্রীরামপুর অঞ্চলের বেশ কিছু ছেলেমেয়েদের মানসিক ও আর্থিক সব রকম সাহায্যের ভাণ্ডার ছিল শর্মিলাদির হাতে। এলাকার রবীন্দ্রজয়ন্তী তাতে শর্মিলাদি, আবার কোন ঘরে নারী অত্যাচার চলছে সেখানেও শর্মিলাদি। একাধারে আদর্শ মা, আদর্শ গৃহিণী, আদর্শ স্ত্রী-ও ছিল শর্মিলা। এক কথায় বলি শর্মিলার বহুমুখীনতাই ওকে এত জনপ্রিয় করেছিল। আজকের দিনের যখন সামাজিক কাজ করার লোকের একান্ত অভাবে দেখা যাচ্ছে, সেই সময় শর্মিলার মতো একজন একনিষ্ঠ কর্মীর এইরকম মর্মান্তিক অকাল মৃত্যু মেনে নেওয়া সত্যিই কঠিন। এ ক্ষতি পূরণ হবার নয়।

পূরবী ঘোষ **উ মা**

পোশাকের বিবর্তন ও ত্বকজনিত সমস্যা

শর্মিষ্ঠা দাস

[পোশাকের প্রথম ও শেষ প্রয়োজন জৈবিক। পরিবেশের তাপ-উত্তাপ থেকে শরীরকে আগলে রাখা। এই সরল সত্যটা ভুলে আমরা একে করে তুলেছি নিছক ফ্যাশন-উপকরণ। যার অবধারিত পরিণতি নানা শারীরিক ক্ষয়ক্ষতি। চর্মরোগ তারই অন্যতম। এই বিপদ সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি লেখিকা চলে গেছেন একেবারে গোড়ার কথায়। যাতে বিষয়টি স্পষ্টতর হয়।]

সম্প্রতি ফরাসি প্রেসিডেন্ট সারকোজি ফ্রান্সে মহিলাদের 'বোরখা' পরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন—এই নিষেধাজ্ঞা সম্ভবত সন্ত্রাসবাদ নিয়ন্ত্রণের কারণে হলেও ক্রমশ বেশি সংখ্যক মুসলমান সম্প্রদায়ের মহিলা যারা বাইরে কাজের জগতে আসছেন তাদের সুবিধের কথাও ভাবা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তে মৌলবাদী ওপ্রগতিবাদী—দু' পক্ষ থেকেই অনেক প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। মৌলবাদীদের প্রতিবাদের কারণ নতুন করে ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন। অনেক প্রগতিবাদীর মতে—পোষাক মানুষের ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার। একজন মহিলার যেমন জিন্‌স্‌-টপ বা মিনিস্কার্ট পরে রাস্তায় বেরোনোর অধিকার আছে, ঠিক সেইরকম নিজের স্বাধীন মত অনুযায়ী কেউ 'বোরখা' বা 'হিজাব' পরেও বেরোতে পারেন। প্রথমেই পোষাক বিতর্কে জড়েয়ে পড়লে আলোচনার অভিমুখ দিক্‌ভ্রান্ত হবার সম্ভাবনা আছে। একটু শুরু থেকে ভাবলে কথায় কথায় অনেক কথাই এসে যায়। সভ্যতার আদিম পর্যায়ে পোষাকের আবির্ভাব শুধুমাত্র দৈহিক প্রয়োজনে। আদম-ইভের গল্প যাই বলুক না কেন, ৩ মিলিয়ন বছর আগের সেই প্রাচীনতম Austratopethicus Afarensis-এর জীবাশ্ম—প্রথম হোমিনিড 'লুসি'র গায়ে পোষাকের কোন চিহ্ন ছিল না কিন্তু লোমশ পুরু চামড়াই তার পোষাকের কাজ করত। এর পর পৃথিবীর অস্বাভাবিক চরম আবহাওয়ার যুগে শীত গ্রীষ্ম বর্ষার হাত থেকে বাঁচতে স্বাভাবিক প্রবণতার আদিম মানব Neanderthal পশুচর্ম পরিধানের উপায় ২ লাখ বছর আগে নিজেই শিখে নিয়েছিল। এরপর মগজাস্ত্র আরো ধারালো হল—৪০,০০০ বছর আগে Cro-magnon মানুষ সেই চারকোণা পশুচর্মের মাঝখানে মাথাটা ঢোকানোর জন্য একটা ফুটো করে বানিয়ে ফেলল বিশ্বের প্রথম টিউনিক! যা দিয়ে উর্ধ্বাঙ্গ আবরণও সম্ভব হল। পশুহাড়ের সূঁচ বানিয়ে টুকরো চামড়া জোড়া দিয়ে যে বিশেষ পোষাক বানাল সে তো 'ড্রেস ডিজাইনিং'-এর ইতিহাসে একেবারে মাইলফলক!

এরপর বৃক্ষবল্কল-তুলাচাষ-বস্ত্র বুনন প্রক্রিয়ায় পারদর্শিতা অর্জন ইত্যাদি অনেক বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে পোষাকের ঐতিহাসিক যাত্রা। এই যাত্রা পথরোখায় পোষাকের প্রাথমিক পর্যায়ে নিয়ন্ত্রক যদি হয় শুধু জলবায়ু ও শারীরিক প্রয়োজন—রেখাটির অপরপ্রান্তে ঠিক বর্তমান বিন্দুতে দাঁড়িয়ে সেই নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় দেখছি বিভিন্ন পোষাক নির্মাণ সংস্থা (প্রধানত বহুজাতিক) এবং বিজ্ঞাপন মাধ্যমকে। শারীরিক ক্ষয়ক্ষতির হিসাব কেই বা রাখে!

"পারফিউম ঢেকে দিয়েছে দুর্গন্ধকে সময়ের
কপোলতলে
অষ্টাদশীর প্রসাধন।
বড় মায়াবী দেখায় তোমাকে-সবাই তোমাকে
ভালবাসে
আর প্রতিদিন তোমার শাড়ীর আঁচল
একটু একটু কেটে ওরা—ওরা নিয়ে যায়,
রুমাল তৈরী করে ..."

(দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় 'কল্লোলিনী কলকাতা)

'ওরা'!; এই 'ওদের' মুনাফা বাড়ানোর জন্য নিজেদের অজান্তে গভীর খেসারত দিয়ে যায় আমাদের মধ্যবিত্ত ঘরের তরুণী কন্যা থেকে শুরু করে স্বল্পবিত্তের পরিচারিকা পর্যন্ত। ওদের মোহময় হাতছানি এড়াতে না পেরে যারা পুষ্টিকর খাবারের পয়সা বাঁচিয়ে বিউটি পার্লারে যায়, নামী কোম্পানির ফ্যাশনদুরস্ত পোষাক কেনে।

আবার একটু আলোচনার প্রাথমিক পর্যায়ে ফেরা যাক, আসলে 'পোষাক ও চর্মজনিত সমস্যা' ব্যাপারটা এতই ওতপ্রোতভাবে যুক্ত যে বিষয়ের 'অভিমুখ'-কে বারবার এদিক ওদিক যাতায়াত করতে হবে। কোরাণেও মহিলাদের 'বোরখা'-র মতো নির্দিষ্ট সর্বাঙ্গ ঢাকা কোনো পোষাকের 'বিধান' দেওয়া নেই—শুধুমাত্র শালীনতা বজায় থাকে এমন পোষাকেরই নির্দেশ আছে। হজরত মহম্মদের ধর্ম প্রবর্তনের অনেক পরে সম্ভবত আরবদেশে প্রথম বোরখা-র প্রচলন হয়। এটা হতেই পারে---ওখানকার

চরমভাবাপন্ন জলবায়ুর কারণে সূর্যের খররশ্মি আর প্রবল ঠাণ্ডার হাত থেকে শরীরকে একটু আরাম দেওয়ার তাগিদে। কিন্তু একমেবাদ্বিতীয়ম হলেও সূর্যদেব (তিনিও পুংলিঙ্গ বটে) একাই শুধু প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ নয়— ধর্মের দোহাই দিয়ে সমাজে পুরুষের ক্ষমতায়নের খেলা শুরু হয়ে যায়। শুধু সূর্য নয় পরপুরুষের দৃষ্টি থেকেও মহিলাদের বাঁচানোর তাগিদে অনেক শরিয়তি আইন তৈরি হয়—সেই আইনে চরমভাবাপন্ন আর নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর কোনও ফারাক থাকে না।

পোষাক নিয়ে স্বাধীনতা, সামাজিক ও ধর্মীয় বিতর্ক যাই থাকুক না কেন কিছু ত্বকজনিত সমস্যার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা কতখানি তা বোঝাতেই এতক্ষণের ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া। এটা প্রথমেই মনে রাখতে হবে মানুষের ত্বক শুধু 'কালো না ফরসা' সুন্দর কিংবা অসুন্দর বিচারের মাপক নয়, ত্বক মানুষের শরীরের হৃদপিণ্ড, যকৃৎ, বৃক্ক, মস্তিষ্ক, ফুসফুস ইত্যাদি যন্ত্রের মতো একটি যন্ত্র এবং শরীরের বৃহত্তম যন্ত্র (Largest organ of the body)। এই ত্বকের কাজও শুধু দেহের আবরণ নয়। ত্বকের বহুমুখী কাজের মধ্যে একটি প্রধান কাজ হল—শরীরের আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ। স্বাভাবিক আবহাওয়ায় স্বাভাবিক শারীরিক অবস্থায় শরীরের আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা মোটামুটি ৩৭° সে থাকে—এই তাপমাত্রাতেই হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, যকৃৎ ইত্যাদি যন্ত্র, সবরকম উৎসেচক, সবরকম শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া সঠিকভাবে চলতে পারে। শরীরের বাইরের আবরণ বা ত্বকের সঙ্গে এর তফাত হতে পারে বাইরের আবহাওয়া অথবা শারীরিক অসুস্থতার কারণে। শরীরের স্বনিয়ন্ত্রিত নিয়মে (Autonomous body thermostat) আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রার নিয়ন্ত্রণ শলাকার (Pivot role) কাজ করে দেহের ত্বক বা চামড়া। (মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস ➔ চামড়ার রক্তজালিকার স্নায়ুগ্রন্থি পশ্চাৎ সংবেদী স্নায়ু (post ganglionic sympathetic fibre) থেকে acetylcholine নামক পদার্থ নিঃসরণ ➔ চামড়ার ধমনিকা (artiriole)-র প্রসার➔ স্বেদগ্রন্থি থেকে স্বেদ বা ঘাম নিঃসরণ)। দেহে আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা বৃদ্ধি হলে উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় স্বেদ নিঃসরণ হয় অর্থাৎ মানুষ ঘামে। এই ঘেমে ওঠা ব্যাপারটা শারীরবৃত্তীয় কাজকর্ম ঠিকঠাক চলার জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। ঘাম হওয়ার ফলে শরীরের অভ্যন্তর থেকে বাষ্পীভবনের লীন তাপ গৃহীত হয় ফলে তাপমাত্রা কমে যায়। অন্য কিছু উপায়ে (যেমন ফুসফুস থেকে বাষ্পীভবন) তাপমাত্রা কিছুটা কমলেও বাইরের তাপমাত্রা যখন ৩৬°সে-এর বেশি থাকে তখন ঘাম ছাড়া আর কোনও উপায়ে শরীরের তাপ বাইরে বিকিরণের কোনও পদ্ধতিই কাজে লাগে না। এবার বুঝুন ব্যাপারটা—প্রসাধন ধরে রাখার জন্য নানারকম ঘর্মনিরোধক (astringent, antiperspirant) যখন ব্যবহৃত হচ্ছে শরীরের ভেতরে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কি গোলই না বাঁধছে!

Neanduthol বা cromagnonথেকে আধুনিক মানুষ Homosapiens Safieus-এ উত্তরণে দেহের অন্য অনেক বিবর্তনের সঙ্গে মানুষের দেহের ত্বকের যে বিবর্তন হয়েছে তা হল —ক্রমশ দেহের লোম হ্রাস পাওয়া, ত্বক মসৃণ ও পাতলা হয়ে ওঠা আর ত্বকের নীচের চর্বিজাতীয় পদার্থ (subcutaneous fat) কমে যাওয়া। আর সামাজিক বীক্ষণে দেখতে গেলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হল ত্বকের উপরের স্তরে মেলানোসাইট নামক কোষে মেলানিন নামক রঞ্জক পদার্থের উপস্থিতি—যা মানুষের রঙ বা বর্ণ নির্ধারণ করে। আধুনিক মানুষের ত্বকেও অঞ্চলভেদে তফাত দেখা যায়, যেমন মেরু অঞ্চলের মানুষের ত্বক ক্রান্তীয় অঞ্চলের ত্বকের চাইতে পুরু।

Neanderthal বা cro-magnon রা তো পশুচর্ম পরেই দিব্যি আনন্দে দিন কাটাচ্ছিল! কর্কশ পশুচর্ম শরীরে অথবা মনে কোথাও কোনো কষ্ট বা হীনমন্যতার কারণ ঘটায়নি কারণ মস্তিষ্কের neocortix-এ নান্দনিক বোধ তখনও তেমন জোরালো ভাবে জন্ম নেয়নি আর লোমশ চামড়ায় সূক্ষ্ম অনুভূতিও প্রখর হয়ে ওঠেনি। সারাদিন পাথর ঘষে অস্ত্র বানিয়ে হরিণ বা বাইসনের পেছনে ছুটে যাদের উদরপূর্তি করতে হত তাদের অত ভাবার সময়ই কোথায়! আশ্চর্য হতে হয় যখন দেখি ৪০,০০০ বছর আগের গুহামানবের সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর চণ্ডীমঙ্গলের 'ফুল্লরা'-র কোনও তফাত থাকে না (বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলি সমসাময়িক লোকজীবনকেই প্রতিফলিত করে)—

"কার্তিক মাসেতে হইল হিমের জনম
জগজনে কৈল শীত নিবারণ বসন
নিযুক্ত করিল বিধি সবার কাপড়
অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়।"

এখানে বারোমাসের অভাবী ফুল্লরার পেটের খিদে ও জীবনযুদ্ধ ত্বকের সূক্ষ্ম অনুভূতির ধার ভোঁতা করে দেয়।

আদিম মানবের লোমশ চামড়া সূর্যরশ্মি থেকে শরীরকে রক্ষা করত বলে তাদের মেলানিনের প্রয়োজন হত না। আমাদের মেলানিন সূর্যালোক শোষণ করে ত্বকে একটা স্বাভাবিক সুরক্ষা আবরণ হিসেবে কাজ করে। ত্বকের নীচের স্তরে সূর্যরশ্মির প্রবেশ রোধ করে মেলানিন ত্বকের ক্যানসার ও অন্যান্য ক্ষতির পরিমাণ কমায়। মেলানিন প্রস্তুতকারক কোষ মেলানোসাইটের গুণগত মাত্রা অনুযায়ী ত্বকের সমস্যা বোঝার সুবিধার জন্য মানুষের ত্বককে সাতভাগে ভাগ করা হয়েছে—একদিকে অতি শ্বেত ত্বকে এই রঞ্জক তৈরি হয় খুব কম আর অতি কৃষ্ণ ত্বকে ঠিক তার উল্টো। উচ্চতা ও পৃথিবীর আঞ্চলিক আবহাওয়ার বৈশিষ্ট অনুযায়ী ত্বকের এই বিবর্তন হয়েছে। বক্র সূর্যরশ্মি প্রাপ্ত শীতগোলার্ধে স্বাভাবিকভাবেই মেলানোসাইট বিশ্রাম নিতে নিতে কিছুটা কর্মশক্তি হারিয়ে ফেলেছে আর গ্রীষ্মগোলার্ধে চড়া রোদে তার

কাজ বেড়ে গেছে, ফলে কৃষ্ণবর্ণের ত্বকে মেলানোসাইট কোষের সংখ্যা এক থাকলেও তার মেলানিন উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বেশি। মানবসভ্যতার শুরু থেকেই এই মেলানিন সবচেয়ে বেথি গুরুত্ব পেয়ে এসেছে বর্ণ-নির্ধারক হিসাবে। এই মেলানিন মাত্রা বেশি কমের জন্য অনেক ক্ষমতার লড়াই, অনেক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। মেলানিনের নিক্তিতে কালো মেয়ের বিয়েতে পণের পাল্লা ভারি হয়। হীনমন্যতায় ভোগা শ্যামাঙ্গী তরুণী লুকিয়ে ফর্সা হওয়ার ক্রিম মাখে। কে তাকে বোঝাবে কালো চামড়ার মানুষদের কিছু কম নেই—বরং প্রাকৃতিক রক্ষাকবচ তার কিছু বেশিই আছে। মানুষের মনে বিজ্ঞানভিত্তিক সচেতনতা গড়ে তোলার ভার কে নেবে! বন্যা ভূমিকম্প দুর্ঘটনার মর্মান্তিক খবরের বিজ্ঞাপন বিরতিতে যারা দেখায় কোন জাঙ্গিয়া পরলে মেয়েরা বেশি চুমু খাবে, সেই মিডিয়া? কদাপি নয়! বাণিজ্যসর্বস্ব বৈচিত্রহীন এক সমসংস্কৃতি সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়ার যে চক্রান্ত চলছে তার সম্মোহনে আকৃষ্ট হয়ে গরীব চীনা তরুণী তার চাকরি করে জমানো সর্বস্ব ব্যয় করে প্লাস্টিক সার্জারি করে নাক চোখা করতে আর আদিবাসী যুবতী (মসৃণ কালো ত্বকের জন্য যার গর্ব হওয়া উচিত) আমাদের কাছে এসে বলে—ডাক্তারবাবু, ফর্সা হওয়ার ওষুধ লিখে দিন। তবু আমরা ভাবি কি জেট গতিতেই না সভ্যতার অগ্রগতি হচ্ছে!

তরঙ্গদৈর্ঘ অনুযায়ী সূর্যরশ্মিকে যেভাবে বিশ্লেষণ করা হয় তা হল:—

পৃথিবীতে যে সূর্যরশ্মি পৌঁছায় তার শতকরা পাঁচভাগ অতিবেগুনী রশ্মি—তার মধ্যে ৯৫-৯৮ ভাগ অতিবেগুনী A রশ্মি তার ২-৫ ভাগ অতিবেগুনী B রশ্মি।

'মেলানিন' কাজ করে আলোক শোষণকারী chromophobe কণা হিসাবে। অতিবেগুনী রশ্মি শোষণ করে chromophobe কণা উত্তেজিত হয়ে ওঠে কিছু রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ত্বকের কোষের ডি এন এ-র কিছু পরিবর্তন হয় যার ফলে সূর্যরশ্মি দ্বারা ত্বকে কিছু স্থায়ী ও কিছু অস্থায়ী পরিবর্তন হয়। সূর্যরশ্মি দ্বারা ত্বকের একশোটিরও বেশি সমস্যা হতে পারে।

দৃশ্যমান আলো ও অতিবেগুনী রশ্মি অতি সংক্ষেপে সেগুলো হল—পুড়ে যাওয়া (sunburn), কালো হয়ে যাওয়া, ক্রমাগত রোদে পুড়ে স্থায়ী তামাটে হয়ে যাওয়া (suntanning),শরীরের অনাবৃত অংশে ত্বকে চুলকানিযুক্ত পুরু ও খসখসে পরিবর্তন (solar karatosis), ক্রমাগত কোষের ডি এন এ-র ক্ষতি হতে হতে elastin, collagen জাতীয় কলা নষ্ট হয়ে চামড়ার স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয়ে স্থায়ীভাবে কুঁচকে যাওয়া (photoaging), সূর্যরশ্মি স্পর্শকাতরতা জনিত বিভিন্ন আকৃতির স্ফোটক (polymorphous light eruption), ফুলে যাওয়া ও চুলকানো (solar urticaria)। এছাড়া আছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া ও বিভিন্ন ত্বকের ক্যানসার (basal cell CA, squamour cell CA, malignant melanoma)-এর প্রকোপ বৃদ্ধি।

Porphyria -র মতো বিপাকজনিত রোগের লক্ষণ চামড়ার অনাবৃত অংশে সূর্যরশ্মি দ্বারা বৃদ্ধি পায়। আরো কিছু রোগ—SLE, LE, Erythema, multiforme, Haper simplex সূর্যালোকে বেড়ে যায়।

ক্রান্তীয় আবহাওয়া যাই বলুক না কেন বর্তমানে ম্যাগাজিন, টেলিভিশম ইত্যাদি মিডিয়াতে বিভিন্ন ড্রেস ডিজাইনার তারকাগণ পোষাক প্রস্তুতকারক কোম্পানির মুখ্যা প্রচারকের ভূমিকায় বলছেন— ফর্মাল হোক বা ক্যাজুয়াল, অফিসে অথবা পার্টিতে একটু সাহসী হয়ে উঠুন। আপনার ডিপ কাট ক্লিভেজ সোরিং টপ আর শর্ট পেন্সিল স্কার্ট বা প্যান্ট, দেখবেন সর্বত্র আপনাকে কেমন মধ্যমণি হতে সাহায্য করছে, অমুক দোকান থেকে অমুক ড্রেস কিনে আপনিও হয়ে উঠতে পারেন সবার রোল মডেল। দেখুন এই স্লিভলেস গেঞ্জি আর টাইট প্যান্টে আপনার ব্যক্তিত্ব কেমন খুলে যাবে।

Australopethicam Afarencis 'লুসি'-র প্রয়োজন ছিল না বলে পোষাক পরে নি, Neanduthal, Cromagnor-রা দৈহিক প্রয়োজনে ও সহজলভ্যতা অনুযায়ী পোষাক তৈরি করেছিল আর আজকের আধুনিক 'লুসি'-রা ড্রেস ডিজাইনারদের পরামর্শে আর সেলিব্রিটিদের বিজ্ঞাপন দেখে পোষাক নির্বাচন করছে দৈহিক ক্ষয়ক্ষতির হিসাব না করেই।

পশুচর্মের পরে এল বৃক্ষবল্কল, তারপর তাঁত ও পশমজাত বস্ত্র। সবচেয়ে পুরোনো তাঁতবস্ত্রের নমুনা পাওয়া গেছে মেক্সিকোতে যা প্রায় ৭০০০ বছর আগে তৈরি। ভারত, পাকিস্তান ও ইজিপ্টের মানুষ ৩০০০ বছর আগে থেকেই বস্ত্রবয়নশিল্পে পারদর্শিতা অর্জন করেছিল। প্রয়োজন থেকেই এই সব গ্রীষ্মমণ্ডলীয়

দেশে তুলো চাষ ও তাঁত বোনার শুরু হয়েছিল কারণ সুতিবস্ত্র উষ্ণ আর্দ্র আবহাওয়ায় আরামপ্রদ। ঋগ্বেদেও তাঁতের বস্ত্রের উল্লেখ আছে। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই সেলাই না করা অবস্থায় বস্ত্রখণ্ডকেই বিভিন্নভাবে পোষাক হিসাবে ব্যবহার করতেন। প্রাচীন শিল্প সাহিত্য থেকে জানা যায় ভারতে পুরুষেরা নিম্নাঙ্গে ধুতি, উর্ধ্বাঙ্গে উত্তরীয় ব্যবহার করতেন। নারীরা বস্ত্রখণ্ডকেই কোথাও মালকোঁচা মেরে, কোথাও লুঙ্গির মতো ঝুলিয়ে কুচি দিয়ে পরতেন। অপেক্ষাকৃত ছোট বস্ত্রখণ্ড দিয়ে স্তনদ্বয় আবৃত করে পেছনে গিঁট বেঁধে তৈরি হত 'স্তনপট্ট', সঙ্গে উত্তরীয়ও থাকত। প্রাচীনকাল থেকেই 'সিল্করুট' দিয়ে রেশমবস্ত্র ভারতে আমদানি হত ঠিকই কিন্তু তা ছিল ধনী ও রাজপরিবারের উৎসবের পোষাক। নিত্যব্যবহারের জন্য সুতিবস্ত্রই প্রচলিত ছিল।

কালিদাস শকুন্তলার পোষাকের বর্ণনা করেছেন এইভাবে
—"সরসিজনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রমং
মলিনমপি হিমাংশোর্লসম লক্ষ্মীং ভনোতি।
ইয়মধিক মনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী ..."

এই 'বল্কল' ছিল বৃক্ষপরিবেষ্টিত তপোবনের আটপৌরে পোষাক, আবার 'বল্কল' বলতে বৃক্ষতন্তুজাত বিশেষ বস্ত্রও হতে পারে কারণ 'শকুন্তলা'-র ৪র্থ অঙ্কে জনৈক ঋষিবালকের উক্তি থেকে জানা যায় বৃক্ষসকল শকুন্তলাকে 'কৌমবস্ত্র' দান করেছিল। (এখনো ভারতের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বাঁশ ও কলাগাছ থেকে তন্তুজাত বস্ত্র প্রস্তুত করা হয়)। পতিগৃহে যাত্রাকালে এই শকুন্তলাই আটপৌরে বস্ত্র ছেড়ে পট্টবস্ত্র পরছে তার উল্লেখও আছে—'পরিধৎস্ব সাম্প্রতং কৌমযুগলম্' (৪র্থ অঙ্ক) কালিদাসের যুগে চীনদেশীয় পট্টবস্ত্রের প্রচলনও ছিল তার প্রমাণ—'চীনংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীরমানস্য' (শকুন্তলা, ১ম অঙ্ক/৩১ শ্লোক)।

১১৯২-তে মুহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণের পরেই ভারতে প্রথম মুসলমান রাজত্বের সূচনা হয়—সম্ভবত সেই সঙ্গেই ক্রমশ দেহ আবৃত করা পোষাকের প্রচলন হতে থাকে। প্রাচীন ভারতে দেহের অধিকাংশ অনাবৃত পোষাকের পক্ষে ত্বকজনিত সমস্যার দৃষ্টিকোণ থেকে যে যে যুক্তি অনুমান করা যা তা হল— প্রথমত মহিলারা পর্দানসীন ছিলেন না ঠিকই আবার খুব বেশি রোদে রোদে ঘুরে বেড়াতেন তার প্রমাণও নেই। গৃহস্থবাড়ি হোক অথবা কাব্যে উল্লেখিত তপোবন—বৃক্ষ পরিবেষ্টিত ছায়াসুলভ অঞ্চলেই ছিল তাদের স্বচ্ছন্দ ঘোরাফেরা আর গৃহকর্মেই তারা বেশি ব্যাপৃত থাকতেন বলে সূর্যরশ্মি থেকে বাঁচতে খুব বেশি ঢাকা পোষাকের প্রয়োজন হত না।

দ্বিতীয়ত ভারতের বেশির ভাগ জায়গাই মধ্যপ্রাচ্যের মতো চরম আবহাওয়াভুক্ত অঞ্চল নয় বলে আবহাওয়াও বাধা হয়ে ওঠেনি। মিশরের পুরুষ মমিদের হাতের অনাবৃত অংশের (Exterior surface of forearm) বাইরের দিকে (যা সরাসরি সূর্যরশ্মি পায়) ত্বকের পরিবর্তন 'ত্বক-পোষাক-সূর্যরশ্মি-আবহাওয়া' এই চক্রের অঙ্গাঙ্গীভূত সম্পর্ক যে চিরকালের তা প্রমাণ করে।

তৃতীয়ত, ক্লোরোফ্লুরোকার্বন জনিত দূষণ সমস্যা তখনো বিজ্ঞান অভিধানভুক্ত হয়নি বলে পৃথিবীর বাইরে গোলাকার ছাতার মতো ওজোন স্তর তখনো অটুট ছিল ফলে ক্ষতিকারক অতিবেগুনী রশ্মির অনেকটাই পৃথিবীতে ঢুকতে বাধা পেত। ১৯৭৯ সালে আমেরিকার আকাশে প্রথম ওজোন স্তরের ফুটো বিজ্ঞানীদের নজরে আসে।

খোলামেলা সুতির পোষাকে খুব স্বাভাবিকভাবেই অনেক চর্মরোগ এড়ানো যেত। প্রাচীন ভারতে কুষ্ঠরোগ, কর্কটরোগের বহু উল্লেখ আছে কিন্তু ছত্রাকজনিত রোগ যেমন দাদ (Dermatophyte গোষ্ঠীভুক্ত বিভিন্ন ছত্রাক দ্বারা হয়), হাজা খুব বেশি দেখা যেত বলে জানা নেই। বিশেষ করে কুচকির দাদ ব্যাপারটা থাকলে তরঙ্গিনী কতটা সক্ষম হতেন ঋষ্যশৃঙ্গমুনির মন জয় করতে আর অর্জুনই বা লক্ষ্যভেদে বাণ নিক্ষেপে কতটা মনঃসংযোগ করতে পারতেন সন্দেহ আছে। অনুমান করা যেতে পারে যখন থেকে শরীরের ভাঁজে ভাঁজে লেপ্টে থাকা সেলাই করা পোষাকের প্রচলন হল পোষাকজনিত চর্মরোগ ও ছত্রাক সংক্রমণের প্রকোপের অধ্যায় শুরু হল। 'পলিয়েস্টার বিপ্লবে'র পর যে সমস্যা আরো বৃদ্ধি পেল। উষ্ণ আর্দ্র আবহাওয়ায় ছত্রাক বংশবৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ পায়। পুরনো দিনের সুতির পোষাক (ধুতি, লুঙ্গি, শাড়ি) আর্দ্রতা শুষে নিত ও হাওয়া চলাচলের ফলে ঘাম তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যেত। সম্প্রতিকালের 'টাইট ফিটিং পোষাক', ড্রেসডিজাইনিং-এর পরিভাষায় 'বডি হাগিং কোদস্'—বিশেষ করে সেগুলো যদি সুতি ভিন্ন অন্য উপাদানে তৈরি হয়, তাতে ঘাম শোষিত হওয়া দূরে থাক, ঘামে ভেজা পোষাক শরীরের সঙ্গে বিশেষ করে ভাঁজে ভাঁজে (বগল, কুঁচকি, স্তননিম্ন ও স্তন মধ্যবর্তী অঞ্চল) অনেকক্ষণ লেপ্টে থাকার ফলে একটা পরিষ্কার জায়গাতেও অনেকদিন টানা জল জমে থাকার ফলে যেমন শ্যাওলা জমে ঠিক সেই রকম ত্বকেও ছত্রাক সংক্রমণ হয়।

ব্রিটিশ উপনিবেশোত্তর ভারতে পোষাক বিপ্লবের ফলে ছত্রাক সংক্রমণের হার কতটা বেড়েছে সে ব্যাপারে কোনও সমীক্ষার ফল হাতে নেই, কিন্তু নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে সব চর্মরোগ চিকিৎসকই একমত হবেন যে ধুতি, লুঙ্গি পরিহিত পুরুষ এবং শুধু শাড়ি, চুড়িদার (প্যান্টি ছাড়া) পরিহিত মহিলা অপেক্ষা জাঙ্গিয়া বা প্যান্টি নিয়মিত আবশ্যিক পোষাক হিসাবে পরিহিত পুরুষ ও মহিলাদের কুঁচকিতে দাদের পরিসংখ্যান অনেক বেশি। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে মেয়েরা ক্রমশ বেশি বাইরের জগতের কাজে বেরোতে শুরু করলেও শাড়ি-চুড়িদারের রক্ষণশীলতা থেকে বেরোতে পুরো বিংশ শতাব্দীটাই লেগে গেল। শুধু ঋত্বিকের

নীতা নয়—ষাট সত্তরের দশকে প্রায় সব মেয়েরাই বাইরে কাজে বেরোলে গায়ের আঁচল বিশেষ ভঙ্গীতে জড়িয়ে সামনে এনে পথ চলতেন। এটা বহু শতাব্দীর জড়তা কাটিয়ে না ওঠার কারণে হলেও নিখরচায় পিঠ, গলা, হাতের বাইরের দিক ঢাকা থাকত (যেগুলো অতিবেগুনী রশ্মি ও দৃশ্যমান আলোজনিত চর্মরোগের জায়গা)—কোনও সানস্ক্রীন ছাড়াই এই সমস্যা থেকে বাঁচা যেত। নিজের পছন্দমতো পোষাক পরার স্বাধীনতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিকিনি অথবা বোরখা সমার্থক এবং সমর্থনযোগ্য। এই মতামতে সম্পূর্ণ সমর্থন রেখেই বলছি—চর্মরোগ চিকিৎসক হিসাবে দীর্ঘদিন সরকারি হাসপাতালে ও ব্যক্তিগত চেম্বারে রোগী দেখার অভিজ্ঞতার দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমানে আলোকজনিত চর্মরোগের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। শরীরের অনাবৃত অংশে যেখানে সূর্যরশ্মি সবচেয়ে বেশি সরাসরি এসে পড়ে (পিঠ, হাতের বাইরের দিক, বুকের উপরিভাগের 'ভি' আকৃতির উন্মুক্ত অংশ, মুখ) সেখানে ফুসকুরি, সাদা ছোপ, দীর্ঘদিন থাকলে একজিমার মতো চামড়া মোটা হয়ে যাওয়া, চুলকানো ইত্যাদি উপসর্গ ও লক্ষণ দেখা যায়। এই সব সমস্যাকে মিলিতভাবে বলা হয় আলোকজনিত বিভিন্ন আকৃতির স্ফোটক (পিম্পল্)। এই সমস্যা পুরুষ অপেক্ষা বর্তমানে মহিলাদের বেশি দেখা যাচ্ছে এবং তাদের নিরাময় বেশ দুষ্কর হয়ে উঠছে কারণ পোষাকের চলতি হাওয়া অনুযায়ী এখন পুরুষদের জন্য ফুলহাতা শার্টই বেশি বরাদ্দ আর মেয়েদের হাত গলা উন্মুক্ত টপ। সমাজে 'ট্রেন্ডি' থাকার জন্য চলতি ফ্যাশনকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা কজনই বা রাখে (পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বিরল ব্যতিক্রম)? গায়ে একটু চুলকানি ফুসকুড়ি তবু সহ্য করা যায় কিন্তু ফ্যাশনে পিছিয়ে পড়ার মতো লজ্জাকর ব্যাপার আর কিছু নেই।

আগের দশকের চাইতে মানুষের ক্রয়ক্ষমতাও অনেক বেড়েছে। ২০০৮-এর আন্তর্জাতিক সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতের মাথাপিছু গড় আয় ১০৪০ ডলার, যদিও এই সমীক্ষাই বলছে—ভারতের ৭৫.৬% মানুষের গড় আয় ২ ডলারের নীচে, ৪১.৬% মানুষের গড় আয় ১.২৫ (আন্তর্জাতিক দরিদ্র সীমা) ডলারেরও নীচে। এই 'নীচে'র নিম্নতম বিন্দুটি খুঁজতে গেলে যেখানে যেতে হবে সেই অঞ্চলে সমীক্ষায় সামিল মানুষদের গাড়ি পৌঁছানোর রাস্তা নেই। সুতরাং যে ধনের আর্থিক আনুকুল্য যারা পাচ্ছে না সেই মানুষগুলোও কিন্তু মাথা পিছু গড় আয়ের ক্ষেত্রে একটা সংখ্যা হয়ে যাচ্ছে। ফ্যাশনের ক্ষেত্রেও এই লঘুকরণ ব্যাপারটা একটা সম-ভাবাপন্ন ক্ষেত্র তৈরি করছে যা সুস্বাস্থ্যকর নয়। আই টি সেক্টর বা এম এন সি-তে কর্মরতা তরুণী অনাবৃত অংশে আলোকজনিত সমস্যা এড়াতে দামি সানস্ক্রিন মাখতে পারছেন (খরচ মাসিক ৩০০-১৫০০ টাকা) কিন্তু একই পোষাক বিপ্লবে সামিল হলেও দরিদ্র কিশোরী বা গৃহবধূটির কিন্তু সেই সানস্ক্রিন আয়ত্তের বাইরে। এখনো আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে বাইরে উঠোনেই রান্না করা, বাসন মাজা ইত্যাদি যাবতীয় গৃহকর্ম সারা হয়। আগে ঘোমটা দিয়ে মাথা পিঠ ঢেকে এইসব কাজ করার ফলে মহিলাদের সূর্যরশ্মিজনিত ত্বক সমস্যা প্রায় দেখাই যেত না। কিন্তু এখন সানস্ক্রিনের পয়সা বাঁচানো এবং চর্মরোগ ঠেকানোর তাগিদেও এ পরামর্শ দিলে নারীবাদীরা অন্য অর্থ করতে পারেন সে ভয় আছে।

সূর্যরশ্মিজনিত ত্বক সমস্যা শুধু যে ফ্যাশন দুরস্ত তরুণ-তরুণীদের তা নয়। গ্রীষ্মকালে সব স্কুলেরই নির্দিষ্ট পোষাক হাফ হাতা শার্ট—স্কুলে যাতায়াতের পথে, টিফিনের সময়ে, খেলার পিরিয়ডে এবং প্রার্থনার সময় ছাত্রছাত্রীদের শরীরের অনাবৃত অংশে প্রচুর পরিমাণে অতিবেগুনীরশ্মি সম্পাতিত হয় এবং তারাও এই আলোকজনিত সমস্যার শিকার হচ্ছে।

'Xcroduma pigmentosa' নামে একটি প্রায় বিরল চর্মরোগ আছে, যে রোগে বোরখা জাতীয় পোষাকই রোগীর জন্য বিজ্ঞানসম্মত বিধান কারণ এই জিনঘটিত চর্মরোগে সূর্যরশ্মি কোষের ডি এন এ-র যে ক্ষতি করে তা আর মেরামত হয় না এবং ক্রমাগত চামড়ার ক্ষত হতে হতে চামড়ার বিকৃতি, ত্বকে ক্যানসার ও অন্ধত্ব দেখা যায়। এই রোগীদের জন্য ফরাসি সরকার কি ভেবেছেন জানা নেই।

ভারতবর্ষের প্রখর রৌদ্রপ্রবণ সমস্ত অঞ্চলে দ্বিচক্রযান আরোহী প্রায় সব মহিলাকেই দেখা যাচ্ছে কনুই পর্যন্ত ঢাকা সাদা দস্তানা আর মুখোশের কায়দায় চোখ ছাড়া মুখের বাকি অংশ ওড়না জাতীয় বস্ত্র দিয়ে ঢাকা অথবা সাদা অ্যাপ্রন জাতীয় পোষাক—'ফিউশন'-এর যুগে এ এক অদ্ভুত 'র‍্যাম্প ওয়াক + জলদস্যু + মধ্যযুগীয় নাইট পত্নী' জাতীয় ফিউশন সন্দেহ নেই কিন্তু ওই যে মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা! সেই অনুযায়ীই এই পোষাকের আগমন মানই গত দু-এক বছর হল হয়তো দু'এক দশকে ঘরের বাইরে বেরোনোর আবশ্যিক তালিকাভুক্ত হয়ে যাবে এই আনুষঙ্গিক পোষাকগুলো।

এবার পোষাক শিল্পের যখন কুটিরশিল্প থেকে বৃহৎশিল্পে উত্তরণ ঘটল সেই পর্যায় এবং তার পরিণামটা একটু দেখে নেওয়া যাক।

তাঁত ও পশমজাত বস্ত্র যতদিন পর্যন্ত কুটিরশিল্প পর্যায়ে ছিল—সুতো ও রঙে ব্যবহৃত উপাদানগুলো মোটামুটি জানা ছিল কারণ চেনা তাঁতির বাড়িতে তার অঞ্চলের খদ্দেরদের ছিল অবাধ যাতায়াত। ১৭৩০ সালে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের যুগে ল্যাঙ্কশায়ারে ল্যুইসপল কর্তৃক পৃথিবীর প্রথম কটন মিল চালু হয়। আমেরিকার সেই ঢেউ পৌঁছায় কয়েক দশক পরে ১৭৯৮-তে স্যামুয়েল স্লটার কটন মিল। পৃথিবী জোড়া জনস্ফীতির কারণে চাহিদা অনুযায়ী যোগানের প্রয়োজনেই 'বস্ত্রশিল্প' একটা বিরাট

জায়গা করে নেয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বস্ত্রশিল্প সমস্ত বৈচিত্রময় নান্দনিকতাসহ রেশম-পশম-সুতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

গুহামানবের পশুচর্ম নির্মিত টিউনিককে যদি পোষাক বিবর্তনের প্রথম মাইলফলক বলা হয় তাহলে তারপরেই দ্বিতীয় মাইলফলক হল ১৯৪১ সালে ম্যাঞ্চেস্টারের ক্যালিকে প্রিন্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্মী জন রেক্স হুইনফিল্ড ও জেম্‌স্ টেনান্ট ডিকসন কর্তৃক Polyeyhelene Terephthalate (PET) আবিষ্কার। এই PET নামক রাসায়নিকটি হল পলিয়েস্টার, টেরিলিন, ডেক্রন ইত্যাদি সমস্তরকম যন্ত্রসংশ্লেষজাত (Synthetic) বস্ত্র উপাদানের প্রাথমিক বস্তু। এরপরে ডুপন্ট নামে এক ভদ্রলোক পলিয়েস্টার তন্তুকে আরো উন্নত করে তার পেটেন্ট কিনে নিলেন এবং ১৯৫০ সালে ইংল্যান্ডের শেফিল্ডের কারখানায় প্রথম বিক্রয়যোগ্য পলিয়েস্টার বস্ত্র প্রস্তুত শুরু হল। এ এক বিশ্বজোড়া বস্ত্র বাণিজ্যের সূচনা পর্ব। এই বস্ত্র সস্তা, সুতির চাইতে অনেক বেশি টেঁকসই, কাচার পর কুঁচকে যায় না, তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়, ইস্ত্রি করার মেহনত লাগে না। এতগুলো গুণসমন্বিত বস্ত্র স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মন জয় করে নিল। কমপক্ষে বেশি টেঁকসই বলে গরীবদেশে এর জনপ্রিয়তা হল আরো বেশি। এই পলিয়েস্টার বিপ্লবের পর একটি চর্মরোগ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে—পোষাকের কারণে স্পর্শজনিত ত্বকের প্রদাহ (contact dermotitis), এর লক্ষণ, শরীরের যে অংশে পোষাকের সঙ্গে ঘর্ষণ বেশি হয় যেমন বাহুমূল, জঙ্ঘা—সেখানে চুলকানি, ফুসকুড়ি লাল হয়ে ওঠা ইত্যাদি দেখা যায়। এইসব পোষাকে ব্যবহৃত রাসায়নিক এবং পলিয়েস্টারের edectrostatic effect ত্বকের কোষের সঙ্গে কিছু রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায় যা এই সমস্যার জন্য দায়ী। বস্ত্রশিল্পে রঙ টেঁকসই ও কোঁচকানো প্রতিরোধ করার জন্য Formaldecycle Resin ব্যবহার করা হয়। এই রাসায়নিক থেকে চামড়ায় অ্যালার্জি হতে পারে। সবচেয়ে ঝামেলার ব্যাপার হল কোন পোষাকে (নামী অনামী যে ব্র্যান্ডই বলুন) ঠিক কী ধরনের তন্তু কত পরিমাণে আছে এবং প্রস্তুত প্রক্রিয়ায় কি কি রাসায়নিক ব্যবহৃত হয়েছে তা জানার কোনও উপায় নেই। সততার সঙ্গে এগুলো যদি পোষাকের সঙ্গে লিখিতভাবে পাওয়ার কোন উপায় থাকত তাহলে পোষাকজনিত চর্মরোগ এড়ানো এবং তার সমীক্ষার কাজের সুবিধা হত।

বিশ্বায়নের দুনিয়ায় সবচেয়ে চিন্তার ব্যাপারটা কি তা নিয়ে যদি একটু ভাবা হয়—উত্তরটা হল 'মানসিক উপনিবেশ'! 'বিনিয়োগ-মুনাফা-বিজ্ঞাপন'-এর চক্র মানুষের মস্তিষ্কের কোষে কোষে যে মানসিক উপনিবেশ গড়ে তুলেছে এবং তুলছে তা ভূমি আগ্রাসনকারী রাজনৈতিক উপনিবেশের চাইতে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। সত্যিই তো! সমাজের কটা মানুষই বা পারে চিন্তায় বা আচার ব্যবহারে নিজস্ব সত্ত্বা বজায় রাখতে? সব রীতিনীতিই অধীত অথবা নিঃশব্দে আরোপিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক রেনেশাঁসের আগে হিন্দু মহিলাদের দরজা-জানলাবন্ধ পালকিতে বসিয়ে পালকিসুদ্ধ গঙ্গাস্নান করানো হত—সেটাও যেমন কুসংস্কার, 'চালু ফ্যাশনদুরস্ত ডিজাইন ও ব্র্যান্ড ছাড়া পোষাক পরব না' এই পণ-ও তেমনই এক কুসংস্কার কারণ কুসংস্কার বলতে আমরা বুঝি কোনো সামাজিক রীতি বা নিয়মের প্রতি যুক্তিহীন অন্ধ আনুগত্যে যা ব্যক্তি বা সমাজের জন্য কোনও সদর্থক দিকনির্দেশিকার কাজ করে না।

কেউ হয়তো বলবেন ফ্যাশনদুরস্ত পোষাক সরাসরি সৌন্দর্যের সঙ্গে যুক্ত আর 'সুন্দর' কথাটি সবসময়ই সদর্থক। কিন্তু আসল ব্যাপারটা হল সৌন্দর্যের কোনও নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। সৌন্দর্যের ধারণাও সদা বিবর্তনশীল। আগের দিনের বঙ্গললনার পানপাতামুখ, ভরা গাল, নিটোল চিবুক আর এক ঢাল কালো চুল এখন বাতিল। হেলেন, ক্লিওপেট্রা-রাও এখন বিউটি কনটেস্ট বা ফ্যাশন শোর র‍্যাম্পে হাঁটলে ডাহা ফেল করতেন।

প্রাচীন গ্রীকদর্শনে উঁকিঝুঁকি মারলে দেখি জেনো ফেন তাঁর বিখ্যাত 'Memoralihilia'-তে সৌন্দর্য সম্পর্কে সক্রেটিসের ধারণার কথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন—তাতে সৌন্দর্যকে মোটামুটি তিনটি শাখায় ভাগ করা হয়েছে—আদর্শ বা স্বাভাবিক সৌন্দর্য যা প্রকৃতিগতভাবে উদ্ভূত, আধ্যাত্মিক বা অন্তরের সৌন্দর্য যা দেখতে হলে চোখের সঙ্গে মনও প্রয়োজন এবং যা শুধু শারীরিক আধারে সীমাবদ্ধ নয়, প্রয়োজনীয় বা ব্যবহারিক সৌন্দর্য। এরপরে প্লেটো এবং নব্য প্লেটোনিক মতবাদের সৌন্দর্যের ধারণার সঙ্গে সবসময় বস্তুদ্বারা তৈরি আধার অর্থাৎ শরীরের (Physical media) সঙ্গে শরীর বহির্ভূত অন্তরের সৌন্দর্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
প্রাচীনকাল থেকেই সবসময় সবরকমের সৌন্দর্যের ধারণার সঙ্গে একটা জিনিস সবসময় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থেকেছে তা হল 'ভালত্ব'। নিবন্ধের উপসংহারে আজকের ঠিক এই সময়ে দাঁড়িয়ে মনে প্রশ্ন জাগে মুনাফাহীন যে কোনরকম 'ভালত্ব' যুক্ত সৌন্দর্যের প্রকৃত দিশা কে দেখাবে?

তথ্যসূত্র:

1. Text Book on Dermatology by FITZ PATRIC
2. The Link Cin Tudge
3. The Greatest Show on Earth by Dawkins
4. Internet

উমা

'প্রমিথিউসের পথে' বইটি আগামী বইমেলায় আবার বেরোচ্ছে।

প্রফুল্লচন্দ্র আজও কেন প্রাসঙ্গিক

মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সার্ধ জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে যে সব লেখা ও আলোচনা দেখা যায় তাতে তাঁর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান সমূহ যথাযথ ভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে বলে মনে হয় না। প্রফুল্লচন্দ্রের কর্মময় বলিষ্ঠ মানবিক মানবিক জীবনাদর্শ আজ যে আরো বেশি প্রাসঙ্গিক তা শিক্ষিত সমাজ, এমনকি বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছেও সেই বার্তা ঠিকমত পৌঁছেছে বলে মনে হয় না। বর্তমান আলোচনায় সেইসব বিষয়ে কিছু তুলে ধরার প্রয়াস করা হল।

বিজ্ঞানের সমাজতত্ত্ব

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির দুটি মাত্রা আছে যা আজকাল বিজ্ঞানের সমাজতত্ত্বে আলোচিত। একটা তার আভ্যন্তরীণ গতি যা মূলত নিয়ন্ত্রিত হয় বিজ্ঞানচর্চাকারীদের বুদ্ধি, মেধা, কল্পনা ও উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা। আর একটি গবেষণাকারীদের পারিপার্শ্বিক ও সমাজ-সংস্কৃতির প্রভাব। যেমন একটি অনুষ্করিত বীজের মধ্যে উদ্ভিদের সম্ভাবনা ও প্রকৃতি সুপ্তাবস্থায় থাকে, যা বাইরের পরিবেশের (জল, আলো, বাতাস, অনুকূল তাপমাত্রা প্রভৃতি) প্রভাবে বিকশিত হতে পারে। প্রাচীন ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞান সভ্যতার যে অত্যাশ্চর্য উন্নতি হয়েছিল তা মধ্যযুগের প্রারম্ভে (মোটামুটি খ্রিষ্টিয় অষ্টম শতক থেকে) একেবারেই স্তব্ধ হয়ে গেছিল। নেমে এসেছিল মধ্যযুগের তমসা যা ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ আমলে ভিন্ন ভাবে পুনরাস্ত হয়। প্রাচীন ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞানের অত্যাশ্চর্য উন্নতির মূলে কাজ করেছিল বৌদ্ধ ধর্মের সুপ্রভাব। আর পতনের কারণ হিসাবে দেখা যায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উত্থান, শঙ্করাচার্যের মায়াবাদী দর্শনের কু-প্রভাব ও জাতিভেদের কঠোরতা। আচার্য রায় তাঁর সুবিখ্যাত 'হিস্ট্রি অব হিন্দু কেমিস্ট্রি' (১৯০২, ১৯০৯) বইতে পৃথিবীতে সর্ব প্রথম দেখালেন যে বিজ্ঞানের অগ্রগতি পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, সমাজ-সংস্কৃতি ও দর্শনের প্রভাবে ত্বরান্বিত বা স্তিমিত হতে পারে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সমাজতত্ত্বের এই গুরুত্বপূর্ণ সত্যের আবিষ্কারক হিসাবে বিশ্বে জোসেফ নীডহামের নাম স্বীকৃত ও বিখ্যাত হলেও আচার্য রায় তাঁর অনেক আগেই হিন্দু রসায়নী বিদ্যায় এটি দেখিয়েছিলেন। জোসেফ নীডহাম (১৯০০-১৯৯৫) 'সায়েন্স অ্যান্ড সিভিলাইজেশন ইন অ্যানসেন্ট চায়না' নামে ২৪ খণ্ডের (প্রথম প্রকাশ ১৯৫৪) যে বিশাল ও অসাধারণ গ্রন্থ রচনার কাজ করে গেছেন তা যথার্থভাবেই বিশ্ববন্দিত। তবে প্রফুল্লচন্দ্র এ ব্যাপারে যে প্রথম পথিকৃত তা ভারতীয় বিজ্ঞানী মহলে আজও স্বল্পজ্ঞাত। কিন্তু আচার্য রায়ের এই গবেষণা ইউরোপ, আমেরিকার বিদগ্ধ মহলে সমাদর ও সম্মান পেয়েছিল। ভারতে, এমন কি কলকাতাতেও, তার যথাযথ স্বীকৃতি ও সমাদর আজও হয় নি। বিশিষ্ট লোকায়ত দর্শন খ্যাত দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এ নিয়ে অনেক খেদ করে গেছেন।

ভ্রান্ত দর্শন, জাতিভেদ প্রথার কঠোরতায় হস্ত-মস্তিষ্কের বিচ্ছেদে ঘটল ভারতীয় বিজ্ঞানের অপমৃত্যু

কিছু দৃষ্টান্ত বিষয়টিকে পরিষ্কার করতে সাহায্য করবে। শবব্যবচ্ছেদ না করে যে অ্যানাটমি শেখা যায় না, চিকিৎসক হওয়া যায় না তা প্রাচীন ভারতের চরক সুশ্রুতরা মনে করতেন, ছাত্রদেরও শেখাতেন। মনু বিধান দিলেন শবস্পর্শ অশুচি। তা করলে জাত যাবে। সুতরাং শবব্যবচ্ছেদের বদলে লাউব্যবচ্ছেদ করে মনুষ্য শরীরের শিরা-উপশিরা প্রভৃতির সংস্থান জানা শুরু হল। চিকিৎসা বিদ্যার অবনতি শুরু হল। শল্যচিকিৎসা (সার্জারি) নাপিতের হাতে দিয়ে বৈদ্যরা জাত বাঁচাতে লাগলেন। ভেষজ উদ্ভিদ চেনবার জন্য বৈদ্যরা বনে-বাদাড়ে বিচরণ বন্ধ করলেন। সে সবের ভার বেদেদের উপর দিয়ে শুধু তর্ক আর পুঁথিচর্চার মধ্যে আবদ্ধ রেখে ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রাণত্যাগ করল। নাক কান কেটে শাস্তি দেওয়া আগে ছিল বেশ সাধারণ ব্যাপার। শল্য চিকিৎসক নাপিতরা অনেক সময়েই সেই কাটা নাক কান সাফল্যের সঙ্গেই জুড়ে দিতে পারতেন। নাপিতদের এই শল্যচিকিৎসা ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল।

ধাতু ও লোহার কাজকর্ম কোল ভীল সাঁওতালদের দিয়ে দেওয়া হল। ঐ সব কারিগরদের আবার বিদ্যা ও শাস্ত্রচর্চা একেবারে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল। মনুর বিধান হল, রামচন্দ্রও যা করেছিলেন, যদি শূদ্র কেউ বেদ শুনে ফেলে তবে তার কানে সীসা গলিয়ে ঢেলে দিতে হবে। যুদ্ধ বিদ্যা ক্ষত্রিয়দের একচেটিয়া করে রাখা হল। আমরা সবাই জানি শূদ্র বীর একলব্য স্বীয় সাধনায় চমৎকার ধনুর্বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন। তার জন্য ক্ষত্রিয় সেবক দ্রোণাচার্য

আঙ্গুল কেটে তার বলবীর্য নষ্ট করে দিয়েছিল। কিছু প্রযুক্তি 'ছোটলোকদের' মধ্যে বেঁচেছিল। কাটা নাক-কান জোড়া দেওয়ার প্রযুক্তির কথা আগেই বলেছি। লোহা ও ইস্পাত প্রযুক্তিও যে কিছু জাতির মধ্যে বেঁচেছিল তাও অনুমান করা যায়। না হলে যুদ্ধের জন্য অস্ত্রশস্ত্রাদি ক্ষত্রিয়রা কোথা থেকে পেত?

অন্য দিকে মনুর বিধানের পরে শঙ্করাচার্য 'মায়াবাদ' (ব্রহ্মসত্য, জগত মিথ্যা) পার্থিব সুখ-সুবিধা ও ভোগের মূল্যহীনতার উপর এত জোর দিয়ে প্রচার করেছিলেন যে তার প্রভাবে ভারতে বিজ্ঞানচর্চার প্রেরণা কমে গেল। ইউরোপে জাতিভেদ এইরকম না থাকায় এবং খ্রিস্টধর্মের মানবতাবাদী উদার ধর্মমত, বিশেষ করে প্রোটেস্টান্ট ধর্মমতের প্রভাবে ইউরোপে নবজাগরণ ও আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম হয় (১৫০০-১৭০০খ্রিঃ)। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ রাখা যায় মনুর বিধান সমূহকে জার্মান দার্শনিক নীট্‌সে বিপুল উৎসাহে সমর্থন দিয়ে গেছেন। নীট্‌সের চিন্তাধারা ও দর্শন হিটলারের নাৎসি মতবাদের পরিপুষ্টিতে সহায়ক ছিল। ভারতে ছোট জাতেরা হল অস্পৃশ্য নিষ্পেশিত নির্যাতিত।

বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণায় হস্ত-মস্তিষ্কের বিচ্ছেদ আজও স্পষ্ট

বর্তমান রসায়ন শিক্ষায় হাতে কলমে কাজের উপর জোর কমে গেছে। শুনেছি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস কমই হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকারা রসায়নাগারে 'রিএজেন্ট' তৈরি, যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ, নির্মাণ কমই করে থাকেন। নিজেরা হাতে কলমে ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাতে তো দেখি না। প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে ক্লাসে নিজে হাতে এক্সপিরিমেন্ট করে দেখাতেন, ছাত্রদের দিয়ে করাতেন। ক্লাসে 'লেকচার ডিমনস্ট্রেশন' (বক্তৃতা প্রদর্শনী) করতেন।

'প্রেডিসেন্সি কলেজে আমার ২৭ বছরের অধ্যাপনাজীবনে আমি সচেতনভাবে প্রধানত নীচের ক্লাসেই পড়াতাম। কুমোর যেমন কাদার ডেলাকে তাঁর পছন্দমত আকার দিতে পারে, হাইস্কুল থেকে সদ্য কলেজে আসা ছেলেদের তেমনি সুন্দরভাবে গড়ে তোলা যায়। আমি কখনও কোন নির্বাচিত বই অনুসরণ করে পাঠদান করতাম না।' আমরা (বর্তমান লেখক) পঞ্চাশের দশকে যখন আই এস সি (মানে এখনকার বারো ক্লাস) পড়তাম তখন শিক্ষকরা ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি প্রভৃতি সব বিষয়েই কিছু লেকচার ডিমনস্ট্রেশন দেখাতেন। পুরোনো কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে লেকচার হলে এখনো দেখা যায় বড় গ্যালারির সামনে মস্ত লম্বা টেবিল যাতে জলের ট্যাপ, গ্যাসের লাইন, সিঙ্ক সব লাগানো আছে। ছাত্রাবস্থায় প্রফুল্লচন্দ্রের সাহিত্য ও ইতিহাসে সমধিক আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তিনি কেমিস্ট্রি পড়তে এসেছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের কেমিস্ট্রির প্রফেসার স্যার আলেকজান্ডার পেড্‌লারের চমৎকার লেকচার ডিমনস্ট্রেশন দেখেই। লেকচার ডিমনস্ট্রেশনের পথিকৃত ছিলেন বিখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে। এখন তো দেখি (বিশেষ করে বামফ্রন্টের আমলে) পার্শ্বশিক্ষক বা আংশিক সময়ের অনভিজ্ঞ তরুণ- তরুণীদের দিয়ে লেকচারের ব্যবস্থা হয়েছে। ইউরোপ-আমেরিকায় সবচেয়ে জ্ঞানী, এমনকি নোবেল বিজয়ীরাও নিচের ক্লাসেই অধ্যাপনা করে থাকেন। ষাটের দশকে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা ১১/১২ জন শিক্ষকই সমস্ত বিভাগের সকল পঠন-পাঠনের কাজ সুচারু রূপে করতাম। এরপর নিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা দ্বিগুণিত। পার্টটাইম ও গেস্ট লেকচারারও নিযুক্ত হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে ঢুণ্ডুক নাথ (১৩ শতক?)-এর বক্তব্য সবিশেষ উল্লেখ্য—

"যাঁহারা শিক্ষণীয় বিষয় পরীক্ষা দ্বারা দেখাইতে পারেন তাঁহারাই প্রকৃত শিক্ষক। যে সকল ছাত্র শিক্ষকের হইতে পরীক্ষাগুলি শিখিয়া নিজে নিজে সেইগুলি করিতে পারেন তাঁহারাই যথার্থ শিক্ষার্থী। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য শিক্ষক ও ছাত্রগণ রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা মাত্র।" মেঘনাদ সাহাও একই কথা বলতেন।

মেডিক্যাল কলেজগুলির আদলে বিজ্ঞান শিক্ষাকে গবেষণা ও উৎপাদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে

১৮৮০-এর দশকে বিলেতে থাকাকালীন প্রফুল্লচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন যে শিক্ষাকে জীবন ও জীবিকার সাথে যুক্ত করা না গেলে সেই শিক্ষা ব্যর্থ। তিনি তাই মনে করতেন রসায়ন গবেষণাগারকে উৎপাদনের সাথে যুক্ত করতে না পারলে জাতির অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব নয়। এই চিন্তাধারা অনুসরণ করেই তিনি জাতীয় বিজ্ঞান বা ন্যাশনাল সায়েন্স-এর ধারণার অনুবর্তী হন। রসায়ন শিক্ষা ও গবেষণার সাথে তিনি নিজের ভাড়া বাড়িতে (৯১, আপার সার্কুলার রোড) রসায়ন শিল্প গড়ে তোলেন তাঁর সামান্য বেতনের টাকা দিয়ে। এটাই কালক্রমে বিরাট বিখ্যাত বেঙ্গল কেমিক্যাল (বিসিজিডব্লিউ) হয় যার পানিহাটির কারখানা আমাদের কল্যাণীর ছাত্রছাত্রীদের আমি ষাটের দশকে দেখিয়ে এসেছি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন শিক্ষা ও গবেষণাকে তখন শিল্পের সাথে একীভূত করতে পারলে বাংলার চেহারাটা পাল্টে যেত। সেই দূরদর্শিতার অভাবে বিজ্ঞানশিক্ষা ও গবেষণা যেমন একদিকে ভাল এগোতে পারল না, অন্যদিকে বাংলায় রসায়ন শিল্পও বাড়ল না। সেই ধারা আজও অব্যাহত। আজকের ইউরোপ আমেরিকার উন্নত দেশগুলির বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগার ও শিল্পের গবেষণাগারের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ উভয়পক্ষরই উন্নতি ঘটিয়েছিল। আমাদের দেশের শিল্প, কৃষি, জনস্বাস্থ্য পরিবেশের বেশিরভাগ প্রয়োজন ও সমস্যা সমাধানের জন্য এখনো আমাদের ইউরোপ-আমেরিকার বিশেষজ্ঞদের সাহায্য

নিতেই হয়। আর আমাদের ছাত্রছাত্রীরা, এমনকি ডক্টরেট পাওয়া ছাত্রছাত্রীরাও, হয় চাকরি পাচ্ছেন না, না হয় নিম্নমানের ভিন্ন কাজ করছেন। আচার্য রায় এইসব নিয়ে অনেক বলেছেন, লিখেছেন।

আমার প্রথম প্রেম

আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে আমি আর আমার বিভাগীয় সহকর্মী বন্ধু সত্য চৌধুরী কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়কে বিধিমত চিঠি দিয়ে রসায়ন বিভাগে বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার সাথে সীমিত স্কেলে ছোট যন্ত্রপাতি, ফাইন কেমিক্যালস্ উৎপাদন ও বিপণন কর্মসূচী হাতে নেবার এক পরিকল্পনা দিই, যার কপি আমি পশ্চিমবঙ্গ শিল্প অধিকর্তা, ভারত সরকার, পুনার ন্যাশনাল কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি সহ বহু বিশিষ্ট রসায়ন বিজ্ঞানীদেরও দিই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প অধিকর্তা, ভারত সরকারের ডেভেলপমেন্ট কমিশনার, পুনার ন্যাশনাল কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি থেকে উৎসাহব্যঞ্জক উত্তর পাই। বিশেষ উৎসাহ পাই বিশিষ্ট রসায়নবিদ শান্তিরঞ্জন পালিতের কাছ থেকে। কল্যাণীর রসায়নবিদ উপাচার্য সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় নিরুৎসাহিত করেন নি। কিন্তু আমাদের রসায়ন বিভাগ থেকে কোন সাড়া না পাওয়ায় আমার সেদিনের স্বপ্ন আজও বাস্তবায়িত হতে পারে নি। আচার্য রায়ের জীবন ও কর্ম নিয়ে ভাবতে বসে যৌবনের সেই প্রথম প্রেম আবার চিত্ত আলোড়িত করল। আজ পর্যন্ত সেই স্বপ্ন আমি সঠিক ও বাস্তবসম্মত মনে করি। পরিবর্তনের বর্তমান সরকারের কাছে আমার নিবেদন নির্বাচিত কিছু আগ্রহী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়কে আমাদের মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের আদলে পুনর্বিন্যাস করে গবেষণা ও শিল্পের যোগ স্থাপন করা হোক। এইসব করতে পারলে আঞ্চলিক শিল্পবিকাশের পক্ষেও সহায়ক হবে। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে (মোট ১৯৭১) আমি লিখেছিলাম এক কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট থেকেই কিছু ছোট যন্ত্রপাতি ও ফাইন কেমিক্যালস্ উৎপাদন ও বিপণন করে এত উপার্জন সম্ভব যা সরকারি অনুদান ব্যতিরেকেই ঐসব প্রতিষ্ঠানগুলি আর্থিক দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স (শুরু ১৯২৬) ডিপার্টমেন্ট দীর্ঘকাল বাংলার বহু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নানারকম যন্ত্রপাতি, মেরামতি ও টেস্টিং করে বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা ও শিল্পে চমৎকার পরিষেবা দিয়ে এসেছিল। আমাদের ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের উৎসাহ, সৃজনশীলতা, বুদ্ধি চমৎকার। অব্যবহারে ও অপচয়ে সে সবই আজও বিনষ্ট হয়ে চলেছে।

সেই এক ট্র্যাডিশন

জাতিভেদ প্রথা যে প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান ও সভ্যতার অগ্রগতিকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল তা পূর্বোল্লিখিত। সেই ধারা ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে আজও কিন্তু অব্যাহত। বাংলায় উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যরা (যারা সমগ্র জনসংখ্যার পাঁচ শতাংশ মতো) রাজনীতি, প্রশাসন, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রযুক্তিতে বিপুলভাবে আধিপত্য করে চলেছে। এই অবস্থার পরিবর্তন না হলে বাংলার উন্নতি সম্ভব না। বিজ্ঞানশিক্ষা ও গবেষণার উন্নতিও সম্ভব না। ইউরোপ-আমেরিকায় আমাদের মতো কঠোর জাতিভেদ নেই। সেখানে আবার খ্রিস্টধর্মের উদার ও মানবিক যে প্রভাব ছিল, তা বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও সামাজিক অগ্রগতিকে সাহায্যই করেছে। আমেরিকায় 'র‍্যাগস টু রিচেস' বহু দৃষ্ট। দরিদ্র চাষি, কামার, ছুতোর, চর্মকারদের ঘর থেকে উঠে এসে পৃথিবীতে সম্মান ও সমাদর পেয়েছে। জ্ঞানবিজ্ঞানের বিপুল উন্নতি ঘটিয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত অজস্র। ভারতে ক্বচিৎ দেখা যায় দু-একটা জ্যোতিরাও ফুলে, বাবা সাহেব আম্বেদকর, মেঘনাদ সাহার মতো কিছু লোকদের। তাই আমি মনে করি অনগ্রসর অঞ্চল ও জাতিসমূহের ছাত্রছাত্রীদের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের সুযোগ বাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এই মত বুর্জোয়া উদারতা নয়। সমাজ ও বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নতির স্বার্থেই বলছি। এতে অনুন্নত অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের সাথে শহরাঞ্চলের স্বচ্ছল উচ্চবর্ণের ছেলেমেয়েদের অভিজ্ঞতা ও ভাবের আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে উভয় পক্ষই উপকৃত হবে। তাই কিছু ছাত্র আসনে অনুন্নত ও গ্রামাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য অগ্রাধিকার দিতে হবে। এটা অবশ্য কিছুটা হচ্ছে শুনেছি নবোদয় বিদ্যালয়গুলিতে কুড়ি শতাংশ আসন মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলের জন্য; বাকি শতকরা আশি ভাগ পৌরঅঞ্চল বহির্ভূত অনুন্নত অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের জন্য। সব খরচই, এমনকি ছাত্রছাত্রীদের থাকা খাওয়ার খরচও কেন্দ্রীয় সরকারই বহন করে থাকে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে ভারত সরকারের এমন চমৎকার জনমুখী প্রয়াসকে বামফ্রন্ট সরকার কেন বিরোধিতা করেছিল। পশ্চিমবঙ্গে আই আই এস ই আর (ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ) নদীয়ার মোহনপুরে গড়ে উঠছে। আঞ্চলিক উন্নতিতে তাদেরও কিছু ভূমিকা থাকবে এটা আশা করা যায়।

স্কুল কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতনাদি আজ বেড়েছে। গবেষণায় অনুদানও বেড়েছে। পঞ্চাশের দশকে অবসরান্তে আমাদের কিছু শিক্ষককে চটের ব্যাগ নিয়ে রাস্তায় ভিক্ষে করতে দেখেছি। আমি ষাটের দশকের গোড়াতে ১৬৭.৫০ বেতনে কলেজের শিক্ষকতা শুরু করি। আজ অবস্থা এত ভাল হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার এত অভাব কেন? আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন থেকে আমরা শিখতে পারি। বিজ্ঞানকে কিভাবে প্রাণবন্ত ও গতিশীল করে জীবন, জীবিকা ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজে লাগানো যায়।

উ মা

আগামী বইমেলায় আমরা থাকছি

সি এম সি ভেলোরে কিছু অভিজ্ঞতা

নিরঞ্জন বিশ্বাস

এ রাজ্যে সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার ওপর সাধারণ মানুষের ভরসা প্রায় তলানিতে এসে ঠেকেছে। বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিং হোমে চিকিৎসার নামে চলছে রাহাজানি। বহু অর্থদণ্ড দিয়েও সুচিকিৎসা তো কান্ ছার মানবিক ব্যবহারটুকুও পাওয়া যায় না। অসহায় রুগী ও আত্মীয়পরিজন। একদিকে মুমূর্ষু প্রিয়জন, অন্যদিকে নার্সিংহোমে নিংড়ে নিচ্ছে। ডাক্তার নিগ্রহ ও নার্সিং হোমে ভাঙচুরের ঘটনা হামেশাই ঘটছে। অসহায় হতাশ মানুষ সুচিকিৎসার আশায় দলে দলে ছুটে যাচ্ছে দক্ষিণ ভারতে। কেন এই অবস্থা? একসময় তো সারা দেশের মানুষের কাছে সুচিকিৎসার পীঠস্থান ছিল এই কলকাতা শহর। আর আজ...? এরকমই এক ভুক্তভোগী মানুষ তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে এ চিঠি লিখেছেন আমাদের দপ্তরে।

আমার স্ত্রী বেশ কয়েকবছর ধরেই পেটের অসুখে ভুগছিল। কোনও কোনও সময় আমাশা আমাশা ভাব, সাথে পেট ব্যথা, আবার কোনও কোনও সময় বমি বমি ভাব ইত্যাদি। মলমূত্র পরীক্ষার সাথে আলট্রাসোনোগ্রাফিও করা হল। ধরা পড়ল গল ব্লাডার-এ স্টোন। গল ব্লাডার আপারেশন-ও করা হল। কিছু স্টোন বেরলো, কিন্তু উপসর্গগুলো নির্মূল হল না। মাঝেমাঝেই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ডাক্তারের পরামর্শে কোলোনোস্কোপি করা হল, কিছুই ধরা পড়ল না। এই ওষুধটা খান, এতে যদি কাজ না হয় তবে আর একটা টেস্ট করতে দেব। ডাক্তারবাবুর এরকম কথাবার্তায় আমরা নিজেরাই বুঝতে পারছিলাম ডাক্তারবাবু হাতড়ে বেড়াচ্ছেন আর সাথে সাথে রোগীরও হতাশা বেড়ে যাচ্ছিল। হাতুড়ে ডাক্তার দেখাচ্ছি এমন নয়, মেডিক্যাল সায়েন্সের বেশ বড় বড় ডিগ্রী আছে এমন ডাক্তারই দেখানো হয়েছে। শেষে স্ত্রীর আগ্রহেই ভেলোর যাওয়া ঠিক হল। টিকিট কাটা হল। ছোট মেয়ে আমাদের একা ছাড়তে সাহস পেল না, গার্জেন হিসাবে আমাদের নিয়ে রওনা দিল। এছাড়া এক ভাগনেও সঙ্গী হল।

সি এম সি (ক্রিশ্চিয়ান মেডিক্যাল কলেজ) ভেলোর সম্পর্কে আগে সে রকম কোনও ধারণা ছিল না। এতটুকু জানতাম এখানে একজন রোগী দু'ভাবে ডাক্তারকে দেখাতে পারেন—জেনারেল ও প্রাইভেট। জেনারেলে ফিজ কম লাগে আর ডাক্তাররা প্রাথমিক মানের, প্রাইভেটে বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা দেখেন, পয়সাও বেশি লাগে। যশোবন্তপুর এক্সপ্রেসে ১১ই অক্টোবর'০৭ তারিখে ভেলোর পৌঁছলাম। পৌঁছেই ডাক্তার দেখাবার জন্য লাইন দিলাম। প্রথমেই প্রাইভেট ডাক্তার দেখাবার জন্য চেষ্টা করলাম। উত্তর এল ১ মাসের আগে কোনও গ্যাস্ট্রোএনটারোলজি-র প্রাইভেট ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া যাবে না। বললাম তা হলে গ্যাস্ট্রোএনটারোলজি-র যে কোনও জেনারেল ডাক্তারেরই অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিন এবং সেটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। ফিজ জমা দেয়া হল, দিন ছয়েকের মাথায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেলাম। লজে ফিরে এলাম। রান্না-বান্না, খাওয়া-দাওয়া আর ডাক্তার দেখাবার দিনটির দিকে চেয়ে থাকা—এভাবেই দিন কাটতে লাগল। দিন তিনেক যাবার পর একটা অস্বাভাবিক ঘটনার সম্মুখীন হলাম। রাত দশটা-সাড়ে দশটা হবে। খেয়ে-দেয়ে আমরা চারজন বসে গল্প করছি—হঠাৎ আমার স্ত্রীর কথা বন্ধ, বসা থেকে ঢলে পড়ল, দাঁত-মুখ এঁটে গেল, চোখের পলক বন্ধ আর কেমন একটা গোঁ-গোঁ শব্দ করতে লাগল। তাৎক্ষণিকভাবে কিছুটা ভয় পেয়েই গেলাম। সাথে সাথে সি এম সি-র এমারজেন্সিতে নিয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ এমারজেন্সিতে এই অবস্থায় থাকার পর আপনা থেকেই জ্ঞান ফিরে এল। ডাক্তারবাবু দেখলেন, সামান্য কিছু ওষুধ দিলেন আর অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেয়া ডাক্তারবাবুকে বিষয়টি জানাতে বললেন। নির্দ্ধারিত দিন এল গ্যাস্ট্রোএনটারোলজি-র জেনারেল ডাক্তারকে পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা বলা হল। উনি শুনলেন, ব্লাড থেকে শুরু করে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করালেন, এন্ড্রোক্রোনোলজির ডাক্তারের কাছে পাঠালেন। প্রায় মাস দেড়েক বিভিন্ন ডাক্তার দেখলেন, বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা হল কিন্তু কোনও রোগের সন্ধান পাওয়া গেল না। আমাদের একটা ধারণা হল হয়তো জেনারেল ডাক্তাররা রোগটা ঠিক ধরতে পারছেন না। অবশেষে আমরা মেডিসিন-এর অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য প্রাইভেট ডাক্তার—কেউ বলেন এক নম্বর ডাঃ জর্জ কুরিয়ান-এর অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিলাম। ডাঃ কুরিয়ান আমার স্ত্রীকে কম্পিউটার স্ক্রিন-টা দেখিয়ে বললেন, আপনার বিভিন্ন রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে সব পরীক্ষাতেই

আপনার রেজাল্ট স্বাভাবিক—শুধু একটা বিষয় ছাড়া। সেটা হল আপনার শরীরে সোডিয়াম-এর অভাব আছে। কয়েকদিন একটু নুনের সরবত খাবেন সব ঠিক হয়ে যাবে। আরও বললেন, আপনি খুব দুশ্চিন্তা করেন এটা ছাড়তে হবে। আমার স্ত্রী-ও ডাক্তারের কাছে অকপটে স্বীকার করল কয়েক বছর আগে ওর পিঠোপিঠি ভাই জ্বরে মারা গেছে, সে শোকটা ও একদম ভুলতে পারছে না। ডাক্তারবাবু বিভিন্নভাবে সহানুভূতি সহকারে বোঝালেন এবং ধীরে ধীরে তার ফলও পাওয়া গেল। স্ত্রী এখন পর্যন্ত ভাল আছে। ওর প্রেসার আছে, প্রেসারের ওষুধটা নিয়মিত খায়। ডাঃ কুরিয়ানকে দেখাবার দিন আমি সাথে ছিলাম। ডাঃ কুরিয়ানের সাথে অন্য ডাক্তারের তফাত এইখানে যে উনি রোগীকে বিশ্বাস করাতে পেরেছেন যে ওর রোগটা মনে—দেহে নয়।

এরপর আমি আমার নিজের সম্বন্ধে একটু বলি। ভেলোরের লজে ২০০৭-এর ২২-এ অক্টোবর, বিকেলবেলা আমার প্রস্রাবের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে রক্ত যেতে থাকে। জলে কাঁচা রক্ত মিশিয়ে দিলে যেমন হয় ঠিক তাই। আমি একটু ভয়ও পেলাম। প্রচুর পরিমাণে জল খেলাম যাতে প্রস্রাবটা পরিষ্কার হয়। আধঘণ্টা বাদে আবার প্রস্রাব করলাম, এবারও ঠিক আগের মতোই। একটু পরে আবার প্রস্রাব করতে গেলাম, প্রস্রাবের চাপ আছে কিন্তু প্রস্রাব হল না। বুঝলাম রক্তটা জমাট বেঁধে প্রস্রাবের নালিটাকে বন্ধ করে দিয়েছে। এবার আমি স্ত্রী, মেয়ে ও ভাগ্নেকে ঘটনাটা জানালাম এবং ওদেরকে এও বললাম মাস তিনেক আগে প্রস্রাবের সাথে কয়েকবার অল্প অল্প করে জমাটবাঁধা রক্ত গিয়েছিল, কোনও জ্বালা-যন্ত্রণা ছিল না। ২৪ ঘণ্টার পর আপনা থেকেই রক্ত যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। একজন পরিচিত ডাক্তারের সাথে বিষয়টি নিয়ে কথাও বলেছিলাম। উনি বলেছিলেন আলট্রাসোনোগ্রাফি করার জন্য। কোনও অসুবিধে নেই বলে আলট্রাসোনোগ্রাফি করা হয় নি।

শুনে ওরাও চিন্তায় পড়ে গেল এবং সাথে সাথে আমাকে নিয়ে এমারজেন্সিতে গেল। অটো করে এমারজেন্সিতে গেলাম। এমারজেন্সিতেও ভীড়। যত সময় যাচ্ছে প্রস্রাব একটু একটু করে জমছে আর যন্ত্রণাও বাড়ছে। অবশেষে আমার ডাক পড়ল। দেখলেন, ক্যাথিটার পরিয়ে দিলেন এবং ইউরোলজি-১-এর প্রাইভেট ডাক্তার ডাঃ কার্তিকেয়নকে দেখাতে বললেন। রাত ১২টা নাগাদ লজে ফিরে এলাম।

দিন দশেকেরে মাথায় ডাঃ কার্তিকেয়নকে দেখালাম। ওনার পরামর্শমতো কিডনি ও ইউরিনারি ব্লাডারের সি টি স্ক্যান করা হল। স্ক্যান রিপোর্ট দেখে ডাঃ কার্তিকেয়ন বললেন, আমার ডানদিকের কিডনিতে টিউমার হয়েছে। কী করণীয় জিজ্ঞাসা করায় বললেন ডান দিকের কিডনিটি আপারেশন করে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে দিতে হবে। তারপর ডাঃ কার্তিকেয়ন নিজের থেকেই বললেন, মানুষ তো একটা কিডনি ডোনেট-ও করে এবং অবশিষ্ট একটা কিডনির উপর নির্ভর করেই সুস্থভাবে সারাজীবন বেঁচে থাকে। আর আপনার ক্ষেত্রে চিকিৎসাটাই হল, যে কিডনিতে টিউমার হয়েছে সেটি বাদ দেয়া—এটা আপনি নিশ্চিন্তে করতে পারেন। লজে এসে ফোনে আপনজনদের মতামত চাইলাম। সবার একটাই মত রোগটা দেশের এমন জায়গায় ধরা পড়েছে যে জায়গাটা ভারতবর্ষের চিকিৎসাক্ষেত্রে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য জায়গাগুলির অন্যতম। চিকিৎসাটা করিয়ে যাওয়াটাই সঠিক কাজ হবে। স্ত্রী, কন্যা ও ভাগ্নের মতামত নিলাম—ওদেরও একই মত। দিন তিনেকের মাথায় ডাক্তারবাবুর সাথে দেখা করলাম এবং জানালাম অপারেশন করাব। জানলাম খরচ পড়বে কমবেশি ২৮ হাজার টাকা। ১১ই নভেম্বর'০৭, হাসপাতালে ভর্তি হলাম। রোগীর দেখভাল করার জন্য রোগীর একজন মহিলা আপনজন রাতে রোগীর কাছে থাকতে পারে। আমার সাথে আমার মেয়ে থাকত। ভর্তির পূর্বেই ২৮ হাজার টাকা জমা দেয়া হল এবং অপারেশনের আগের দিন আমার শ্যালক এক বোতল রক্ত সি এম সি-র ব্লাড ব্যাঙ্কে দান করল। অবশেষে অপারেশন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল। মেয়ের কাছে শুনেছি ডাঃ কার্তিকেয়ন স্ট্রেচার ধরে আমার বেড পর্যন্ত এসেছেন এবং কাগজে ছবি এঁকে কি অপারেশন হয়েছে তা বুঝিয়ে বলেছেন। বললেন সেরে উঠতে একটু সময় লাগবে। রোগী ছাড়া দু'জন থাকলেই চলবে। ২২ নভেম্বর'০৭ হাসপাতালের ইনডোর থেকে ছাড়া পেলাম। অপারেশন, ঔষধ পত্র, বেড ভাড়া সাকুল্যে খরচ হল ৩৫,০০০ টাকা। সপ্তাহে দু'দিন ও পি ডি-তে ডাঃ কার্তিকেয়নকে দেখাতে হত। অবশেষে ২০শে ডিসেম্বর '০৭ ও পি ডি থেকে ছাড়া পেলাম। ছাড়া পাওয়ার পর প্রথম এক বছর ৬ মাস পরপর চেক আপ-এ যেতে হয়েছে। তারপরে ১ বছর পর জানুয়ারি'১০-এ চেক আপ-এ গিয়ে গিয়ে দেখা গেল ইউরিনারি ব্লাডার-এ একটা টিউমার দেখা দিয়েছে। অপারেশন করে টিউমারটা বাদ দেয়া হয়েছে। মাস ছয়েক পরপর দ্বিতীয় অপারেশনটির জন্য চেক আপ-এ যেতে হচ্ছে। সামনে অক্টোবর '১১ চেক আপ-এ যাচ্ছি। চিকিৎসাক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি নজরে পড়েছে তা নিম্নরূপ—

১. ভেলোরে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশের রোগীই সবচেয়ে বেশি। ভাষাটা একটা বড় সমস্যা হলেও ডাক্তাররা ইংরেজি, হিন্দির পাশাপাশি বাংলা ভাষা ও বোঝা এমন কি কোনও কোনও সময় ব্যবহারের চেষ্টা করেন। আমার ধারণা ভাষাগত দূরত্বের জন্য রোগীর সমস্যা সঠিকভাবে বুঝে নিতে ডাক্তারদের অসুবিধা হয় না। রোগীর প্রতি মমত্ববোধ অনুভব করার মতো। একই বিষয় একাধিকবার জিজ্ঞাসা করলেও চিকিৎসকগণ ধৈর্য হারান না বা বিরক্ত হন না। রোগাক্রান্ত মানুষ সুস্থ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে পরিবার-পরিজনের সাথে ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য

স্বাস্থ্যকর্মীদের সেবামূলক ভূমিকার প্রয়োজন—যা ভেলোর দেয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

২. আমার দু'বার অপারেশনের সময় (কিডনি ও ইউরিনারি ব্লাডার) মোট দিন পনেরোর জন্য হাসপাতালে ইন্ডোর রোগী হিসেবে থাকতে হয়েছে, ঐ সময় সিস্টারদের কর্তব্যপরায়ণতা দেখেছি। তাদের আন্তরিকতা ও কর্মপরায়ণতা দেখে মনে হয়েছে দুস্থ মানুষকে সুস্থ করে তোলার মধ্যেই তাদের তৃপ্তি ও আনন্দ।

৩. প্রতিদিন (ছুটির দিন ছাড়া) একদম ভোর হতেই মনে হয় যেন হাসপাতাল চত্বরে মেলা বসেছে। চারিদিকে ব্যস্ততা। হাসপাতাল চত্বরে সিকিউরিটি গার্ড-দের কর্মতৎপরতা, অনুসন্ধান অফিসগুলির সক্রিয়তা লক্ষ্য করার মতো। ও পি ডি (আউট পেশেন্ট ডিপার্টমেন্ট)-তে অসংখ্য চেয়ার ফ্রেমে বসানো। কোনও চেয়ার খালি অথচ লোক দাঁড়িয়ে আছে এমনটি চলবে না। সিকিউরিটি গার্ড-এর নজর পড়ামাত্র আপনাকে বসিয়ে দেবে। একদিন একটা ঘটনা দেখে একটু অবাকই হলাম। আমি একজন ক্যান্সার পেশেন্ট। ট্রেনে কনসেশন পাবার অধিকারী। ফর্ম পূরণ করে সুপারের কাছে নিয়ে গেলাম। উনি সাথে সাথে সই করে নিজেই স্ট্যাম্প মেরে আমার হাতে ফেরত দিলেন। দু'মিনিটও লাগল না। ভেবেছিলাম ভেলোরের মতো হাসপাতালের সুপার কত ব্যস্ত থাকবেন, সময় কিছুটা লাগবে ধরেই এগিয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু হল উল্টো। কর্মসংস্কৃতি কাকে বলে!

উপসংহারে বলি, ভেলোরের সি এম সি সম্পর্কে কিছু ধারণা বা অভিজ্ঞতা রাখতে এর প্রতিষ্ঠাত্রী সম্পর্কে কিছু না বললে বলা অপূর্ণ থেকে যায়। প্রতিষ্ঠাত্রী ডাঃ ইডা সোফিয়া স্কুডার। বাবা খ্রিস্ট ধর্মযাজক ও চিকিৎসক। বাবা-মা ভেলোরে থাকতেন। ১৮৯০ সালে স্কুল ছাত্রী ইডা সোফিয়া স্কুডার তাঁর পৈতৃক বাসভূমি আমেরিকা থেকে ভেলোরে আসেন। ভেলোরে অবস্থানকালে একটি রাতে একই ধরনের তিনটি ঘটনা ইডা স্কুডারের জীবনের দিগদর্শন রূপে ছাপ ফেলে। তিনটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রথম সন্তান সম্ভবা। তিনটি গৃহবধূর প্রসবকালীন যন্ত্রণাকাতর অবস্থা থেকে পরিত্রাণের আশায় তিনটি পরিবার সেই রাতে একে একে কিছুক্ষণ পরপর ইডা স্কুডারের কাছে ধর্ণা দেয়—অনুরোধ করে প্রসবকাতর বধূদের প্রসবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে। ইডা স্কুডার প্রত্যেক ব্যক্তিকেই বলে ও নিজে ডাক্তার নয়, ওর বাবা ডাক্তার—এরা যেন ওর বাবার কাছে নিয়ে যায়। তিনটি জায়গা থেকে একই উত্তর আসে—মরতে হয় মরুক, তবুও আমার ঘরের বৌ পরপুরুষের মুখ দেখবে না। ইডা স্কুডার সারা রাত ঘুমোতে পারলেন না। সকালে তাদের গৃহকাজে সাহায্যকারী স্থানীয় পরিচারককে ঐ তিনটি বধূর খোঁজ নিতে এলাকায় পাঠায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকটি উক্ত তিনটি বধূরই মৃত্যু সংবাদ নিয়ে ফিরে আসে। শুনে ইডা স্কুডারের বদ্ধমূল ধারণা হল পরম পিতা গড তার জীবনের করণীয় কাজটি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সেটি হল চিকিৎসা বিদ্যা শিখে ভারতবাসী বিশেষ করে মাতৃজাতি ও শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষার কাজে নিজেকে নিযুক্ত করা। ইডা স্কুডার আমেরিকা ফিরে গেলেন। ১৮৯৯ সালে আমেরিকার কর্নেল ইউনিভার্সিটি মেডিক্যাল কলেজ থেকে চিকিৎসা বিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯০০ সালে ভারতে ফিরে এসে ভেলোরে ১ (এক) শয্যাবিশিষ্ট ক্লিনিক খোলেন। বর্তমানে শয্যাসংখ্যা ২৫১২, আছে বিশেষ বিভাগ (স্পেশালাইজড্ ডিপার্টমেন্ট/ইউনিটস)। ইডা স্কুডার চেয়েছিলেন সি এম সি ভেলোর পীড়িত মানুষের কাছে নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা কেন্দ্র হয়ে উঠবে আর এর মান হবে আন্তর্জাতিক। বলা যায়, তাঁর চাওয়ার পথেই ভেলোর এগিয়ে চলেছে—দেশবিদেশের পীড়িত মানুষের উপস্থিতিই তা প্রমাণ করে।

পরিশেষে বলি, পীড়িত মানুষের সেবামূলক কাজের সাথে যুক্ত থেকে পরিসেবা প্রদানকারীদের মধ্যে সামাজিক মানসিকতার উত্তরণ ঘটছে এবং আমার ধারণা এই মানসিকতা অব্যাহত থাকবে এবং এরও উত্তরণ ঘটবে।

উ মা

বিজ্ঞানের খবর

সম্প্রতি 'Food Research International' জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণা পত্র থেকে জানা যাচ্ছে, ভারতে যে সকল ফল সাধারণভাবে পাওয়া যায়, অ্যান্টি অক্সিডেন্ট-এর পরিমাপ অনুযায়ী তাদের মধ্যে সবচেয়ে উপকারি ফলটির নাম হল পেয়ারা। আর সবচেয়ে কম পুষ্টিকর ফলটি হল আনারস। প্রতি ১০০ গ্রাম পেয়ারায় যেখানে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট-এর পরিমাণ ৪৯৬ মিলিগ্রাম, সেখানে আনারস-এ এই পরিমাণ হল ২২ মিলিগ্রাম। অন্যান্য ফলের মধ্যে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট আছে প্রতি ১০০ গ্রামে—কুল-এ ৩৩০ মিলিগ্রাম, আতা-য় ২০২ মিলিগ্রাম, আম-এ ১৭০ মিলিগ্রাম, আপেল-এ ১২৫ মিলিগ্রাম, আঙুর-এ ৮৫ মিলিগ্রাম, সবেদায় ৫৫ মিলিগ্রাম, পেঁপে-তে ৫০ মিলিগ্রাম, কলা-তে ৩০ মিলিগ্রাম, মুসম্বি লেবু-তে ২.৬ মিলিগ্রাম, কমলালেবু-তে ২৪ মিলিগ্রাম, তরমুজ-এ ২৩ মিলিগ্রাম।

আমাদের শরীরে এই অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট-এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট আমাদের দেহের মধ্যে থাকা কিছু স্বাধীন পদার্থ (ফ্রি র‍্যাডিক্যালস্) যারা শরীরের একাধিক কোষকে নষ্ট করে দিতে সক্ষম এবং যে কারণে আমাদের ক্যানসার ও বিভিন্ন বংশগত রোগ হয়ে থাকে। তাদের বিরুদ্ধে আমাদের শরীরকে লড়াই করতে সাহায্য করে। এই গবেষণাটি আরও একবার প্রমাণ করল—কম দামি ফল মানে কম উপকারি—এ ধারণাটি ঠিক নয়। **তথ্যসূত্র: Times Of India, 12/10/2011**

বনবিহারী বিদ্রোহী সংসারীও

সমীরকুমার ঘোষ

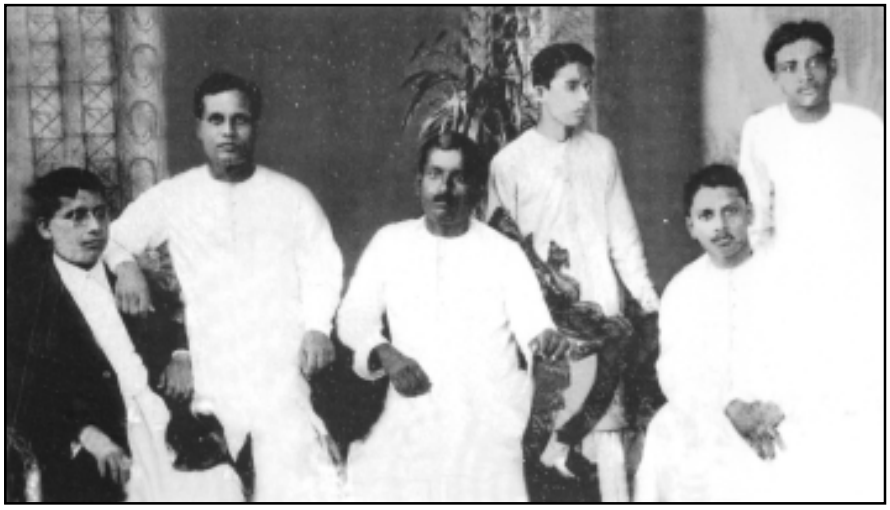

দাদা ও ভাইদের সঙ্গে বনবিহারী। একেবারে বাঁদিকে বসে বনবিহারী। মাঝখানে বসে বড়দা। তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে বিনোদবিহারী।

গত সংখ্যার পর

ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে লেখালিখির জন্য খোঁজখবর করতে গিয়ে ঘটনাক্রমে যোগাযোগ হয়ে গেল তাঁর নাতি মনোরোগ চিকিৎসক দেবাশিস ভট্টাচার্যের সঙ্গে। দেবাশিসবাবু বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের বড় মেয়ে ঊষাদেবীর পুত্র। একজন চিত্রকরও বটে। তিনি যে বনবিহারীর নাতি তা জানতে পারলাম তাঁর ছবির প্রদর্শনীর প্রচারপত্র থেকে। ওঁর দাদুকে নিয়ে আমাদের আগ্রহ দেখে উনি অকৃপণভাবে সাহায্য করলেন। পেলাম বনবিহারীর পারিবারিক ছবি সমৃদ্ধ 'ছবিলেখা' পত্রিকা এবং এক্ষণ পত্রিকার বনবিহারী সংখ্যার প্রতিলিপি। বন্ধু রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী রাজশ্রী ভট্টাচার্য দিল বিনোদবিহারীর লেখা 'চিত্রকর' বইটি। ওঁদের ঋণ প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভাল।

শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ছিলেন বনবিহারীর ছোট ভাই। ওঁরা ছিলেন ছ' ভাই। সবচেয়ে বড় যিনি ছিলেন তাঁর নাম ব্রজবিহারী। বনবিহারী ছিলেন মেজ। তারপর যথাক্রমে ছিলেন বঙ্কুবিহারী, বিজনবিহারী ও বিমান বিহারী। সবচেয়ে ছোট ছিলেন বিনোদবিহারী। বিনোদবিহারীর লেখা থেকেই জানতে পারি তাঁদের বাবা বিপিনবিহারী অত্যন্ত সম্পন্ন পরিবারের সন্তান ছিলেন। তিনি যে ছেলেবয়সে পয়সা দেখেছিলেন এবং তাঁর মন থেকে প্রথম জীবনের কথা কখনোই মুছে যায় নি। বিনোদবিহারী লিখছেন, 'অপরদিকে আমার মা ছিলেন পণ্ডিতের কন্যা, সোজা কথায় সাধারণ ঘরের মেয়ে। আমার ভাইদের মধ্যে অনেকেরই কৌতূহল ছিল আমাদের পূর্বপুরুষরা কীরকম বড়লোক ছিলেন জানতে। মাকে অনেকবার এ প্রশ্ন করা হয়েছে, কিন্তু মা বলতেন, 'যা গেছে তা নিয়ে ভেবে আর কী লাভ, যা আছে তাইতে তোরা খুশি থাক, এই আমি চাই।'

বনবিহারী নিজের ছোটবেলার কথা কিছু লিখে যাননি। সে সব লেখার লোকই তিনি ছিলেন না। কিন্তু বিনোদবিহারীর লেখা ছোট্ট এই বর্ণনা থেকেই তাঁদের বাবা-মায়ের চারিত্রিক ও মানসিক একটা ছবি পাওয়া যায়। বিনোদবিহারী আরও জানাচ্ছেন, 'আদর্শ জিনিসটা একরকমের সংক্রামক ব্যাধির মতো। শরীরে প্রবেশ ক'রে মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে স্থান ক'রে নেয়, তারপর তার প্রভাব চলতে থাকে সারা জীবন। আমার বাবা বিপিনবিহারী বলতেন, 'মানুষকে কখনো লাঞ্ছিত করবে না, কখনো বঞ্চিত করবে না।' তাঁর পুত্রদের সকলেই এই একই কথা বলেছিলেন। বোধহয় জীবনে লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত ভালভাবেই হয়েছিলেন বলে তাঁর এই অভিজ্ঞতাটি ছেলেদের জানিয়েছিলেন। 'ঋণ নিয়ে শোধ দেবে। শোধ দিতে গিয়ে যদি অনাহারে থাকতে হয় তাও থাকবে।' যতদূর জানি ভাইদের মধ্যে কেউই কাউকে লাঞ্ছিত বা বঞ্চিত করেন নি এবং ঋণ নিয়ে কখনো ভুলেও যান নি।' আমার মা অপর্ণা দেবী বলেছিলেন, 'মানুষকে বিশ্বাস ক'রে ঠকা ভাল, অবিশ্বাস ক'রে জেতার চাইতে।' আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে আমার মায়ের এই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে আমি পারি নি, আবার ভুলেও যাই নি। তাঁর এই উপদেশের গভীর তাৎপর্য ক্রমে আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি। ভালভাবেই আমি লক্ষ করেছি যে নিজের দুর্বলতাই অবিশ্বাসের সর্বপ্রধান কারণ। মনুষ্যত্ব বিকাশের পথে সন্দেহ জিনিসটা বেশ ক্ষতিকর। অবশ্য

সন্দেহের দ্বারা সাংসারিক জীবনে কিছু লাভ হয়ত হয়, তবু মনে হয় মায়ের এই আদর্শ উপেক্ষণীয় নয়।'

আমরা, যাঁরা বাড়িতে অবাঞ্ছিত লোক এলে ছেলেমেয়েদের বলতে শিখিয়ে দিই 'বাবা বাড়িতে নেই', ভাল স্কুলে ভর্তি করতে সন্তানের বয়স ভাঁড়াই এবং সেটা তাকে বলতে শিখিয়েও দিই। অফিসের কাজের জন্য দেওয়া গাড়িতে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে বা স্ত্রীকে 'মার্কেটিং'-এ পাঠিয়ে গর্ববোধ করি কিংবা ঘুষলব্ধ টাকা বা জিনিস সন্তানদের সামনেই স্ত্রীকে আলমারিতে রাখতে দিই—তাঁদের সঙ্গে বিপিনবিহারী-অপর্ণা দেবীদের কোনো মিল খুঁজতে যাওয়া মূর্খামি। ওঁদের কথা আর জীবনচর্যায় সঙ্গতি ছিল বলেই ৭৩ বছর বয়সে এসে বিনোদবিহারী মায়ের উপদেশের গভীর তাৎপর্য উপলব্ধির কথা বলতে পারেন। সারা জীবন তা মেনে চলার চেষ্টা চালানো সত্ত্বেও। বনবিহারীর চারিত্রিক দৃঢ়তা , লড়াকু মনোভাব, সততা, নিষ্ঠার উৎস—খুঁজে পেতে তাই একটুকুও বেগ পেতে হয় না।

মুখুজ্জে পরিবারের আদিবাস ছিল হুগলির গরলগাছায়। ডা. দেবাশিস ভট্টাচার্য মনে করেন, বিষয়াসক্তি ও বিষয়বুদ্ধির চূড়ান্ত অভাবের ফলে পূর্ববঙ্গীয় না হয়েও এই পরিবারের প্রায় সকলেই উদ্বাস্তুর মতো জীবন কাটিয়েছেন, কেউ বা ভেসে বেড়িয়েছেন ভবঘুরের মতো। দেবাশিসবাবু এও জানিয়েছেন, পিতা গৃহকর্তা হলেও তাঁর মেজদা ডা. বনবিহারী মুখোপাধ্যায় ছিলেন প্রকৃত অর্থে পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু। কথাটা অতিশয়োক্তি নয় বিনোদবিহারীর 'চিত্রকর'-এ তার প্রমাণ রয়েছে। ছয় ভাই ও এক বোনের মধ্যে বিনোবিহারী সবচেয়ে শুধু বয়সে ছোট ছিলেন তাই নয়, দুর্বল মতও ছিলেন। ছোট থেকেই দৃষ্টিশক্তি ছিল ক্ষীণ। সেকালের বিখ্যাত চোখের ডাক্তার মেনার্ড সাহেব ওঁর চোখ পরীক্ষা করে রায় দিয়েছিলেন, লেখাপড়া করলে ছেলের চোখ যেটুকু আছে, সেটুকুও থাকবে না। তবে স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পারলে কিছু লাভ হতে পারে, কিন্তু চোখের ডাক্তারের দ্বারা কিছু হবে না। বনবিহারী গোটা পরিবারের অভিভাবকত্ব তো করতেনই, এই ছোটভাইটিকে সন্তানবৎ দেখতেন। উদ্বিগ্ন থাকতেন ভাইয়ের চোখ যাতে একদম নষ্ট না হয়ে যায়। ছোটবেলায় গুগলির ঝোল, মেটে, ছোট মাছ ইত্যাদি খাওয়ানো ছাড়াও গোটা গায়ে তেল মেখে স্বাস্থ্য ফেরানোর উদ্‌যোগ চলত, দৃষ্টি ফেরানোরও। দাদা ভাইকে নিয়ে গড়ের মাঠে লাল সূর্যোদয় দেখতেও নিয়ে যেতেন। স্কুলের পড়াশোনা যে ভাইটির চোখের ক্ষতি করবে তা জানতেন বনবিহারী। তাঁর সঙ্গে শান্তিনেকতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কালীমোহন ঘোষের পরিচয় ছিল। তাঁরই পরামর্শ ও সহায়তায় বিনোদবিহারীকে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ভর্তি করা হয়। বনবিহারীর ইচ্ছে ছিল, ক্ষীণদৃষ্টি নিয়ে তাঁর ছোটভাই শান্তিনিকেতনের বহুমুখী কর্মকাণ্ডে এমন কিছুতে ব্যাপৃত হোক, যাতে চোখের ওপর চাপ না পড়ে। শান্তিনিকেতনে কিছুদিনের মধ্যে বিনোদবিহারী কলাভবনে আসন পেতে বসেছে শুনে বনবিহারী উদ্বিগ্ন হয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শিল্পগুরু নন্দলালও চাননি বিনোদবিহারী ছবি আঁকার জগতে আসুক। তবু রবীন্দ্রনাথ কলাভবন থেকে সরিয়ে নেন নি বিনোদবিহারীকে। বলেছেন, 'ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা কোরো না। সকলকে নিজের পথ খুঁজে নিতে দাও।' ডাক্তার বলছে ছেলে অন্ধ হয়ে যাবে, মোটা চশমা চোখেও ইস্কুলে যার স্থান হচ্ছে না, তার কী হবে—এমন ভাবনা নিয়ে পরিবারের সবাই যখন ঘোর দুশ্চিন্তায়, মা অপর্ণা দেবী প্রত্যয়ী কণ্ঠে বলেছিলেন, 'ও নিজের ভাতকাপড় ক'রে খাবে, তোদের কোনো চিন্তা নেই।' ছেলের প্রতি মায়ের এই বিশ্বাসই প্রতিধ্বনিত হয়েছিল শিক্ষাগুরুর কণ্ঠে। 'এই ভাইটিকে বনবিহারী আপন হাতে মানুষ করেন এবং সে যেন ধর্ম, ঈশ্বর, পরকাল, উপাসনা ইত্যাদি সর্বপ্রকার সংস্কার থেকে মুক্ত থাকে সে জন্য কোনো ব্যবস্থার ত্রুটি করেননি। বিনোদবিহারীর ডাকনাম ছিল 'নন্তু'। বনবিহারী তাকে ডাকতেন 'নাস্তিক' বা 'নাস্তে'। জানিয়েছেন মুজতবা আলী। আকাশে বিরাট ধূমকেতু দেখা দিয়েছে। সবার সঙ্গে বিনোদবিহারীও ছাদে ওঠেন দেখতে। জানিয়েছেন, 'ভয় এবং বিস্ময় মিলে কী প্রচণ্ড শক্তির সৃষ্টি হয় তার প্রথম পরিচয় পেলাম আকাশে ধূমকেতু দেখে'।' সেখানেও ভীত ভাইকে 'তোর কিসের ভয়' বলে আশ্বস্ত করেন দাদা। বনবিহারী গোদাগাড়ির রেল-কলোনির ডাক্তারের চাকরিতে বদলি হন। মায়ের সঙ্গে বিনোদবিহারীও গোদাগাড়িতে গিয়ে ছিলেন দাদার বাংলোতে। স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যই কলকাতার বাইরে থাকার এই ব্যবস্থা হয়। বনবিহারী ভাইকে কখনও ডবলিউ ডবলিউ জেকবের বই খুঁজে আনতে বলেন, কখনও তার সঙ্গে দাবা খেলেন। রাতে বিছানায় শুয়ে দিনে যে সব গল্প পড়েন, তার গল্প ভাইকে বলে যান। বনবিহারীকে নিয়ে লিখতে গিয়ে বিনোদবিহারী প্রসঙ্গে এত কথা জানানোর উদ্দেশ্য, পারিবারিক মানুষ হিসাবে বনবিহারীর ভূমিকাটা পাঠকের গোচরে আনা।

বিনোদবিহারী শান্তিনিকেতনে প্রবেশ করার পর, সেই জীবনের কথা যা লিখেছেন, তাতে কোথাও তাঁর মেজদা বনবিহারী নেই। তাই আমরা জানতে পারি না তাঁর আদরের 'নাস্তে' যখন পঞ্চাশ পেরোতে না প্রোতেই মুখোমুখি হন পূর্ণ অন্ধত্বের, তখন বনবিহারীর কী প্রতিক্রিয়া ছিল। তবে ততদিনে ভাইয়ের ভারতজোড়া নাম। তবুও!

বনবিহারীর প্রয়াণের পর পরিমল গোস্বামী যুগান্তর পত্রিকায় তাঁকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। পুলিনবিহারী সেন সেটি বিনোদবিহারীর কাছে পাঠান। এতে খুশি হয়ে বিনোদবিহারী আন্তরিক ধন্যবাদ জানান লেখককে। পুলিনবাবুকে এও বলেন, 'যদি পরিমলবাবু বা আর কেউ যদি দাদার সম্বন্ধে কিছু তথ্য চান

তবে আমার পক্ষে যতদূর সম্ভব আমি সাহায্য করতে প্রস্তুত।' শুধু এটুকুই নয়, হদিস দিয়েছেন, 'চারুবাবু, তুলসীবাবু, দাদা, বেপরোয়া প্রকাশের সময়ের তোলা...' গ্রুপ ফোটোটা চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে পাওয়া যেতে পারে। এ থেকেই বোঝা যায় দাদার প্রবল ব্যক্তিত্বে, চোখ নিয়ে উদ্বেগে ভাইয়ের কাজকর্মে নানা বিধিনিষেধ আরোপ ইত্যাদি নিয়ে ছোটবেলায় ভাইয়ের মন বিদ্রোহী হলেও হতে পারে, কিন্তু দাদার প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা বা কৃতজ্ঞতায় তা দাগ কাটতে পারে নি।

বনবিহারীর জীবন যেন ঘোর আস্তিক্য থেকে নাস্তিক্যের দিকে সফর। যার মধ্যে ধ্রুবক হিসাবে রয়ে গিয়েছে যুক্তিবাদ আর মানবিকতা। জীবনের প্রথমভাগে নৈয়ায়িক দাদু ছাড়াও দুই উদার মহাপ্রাণ ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেন বনবিহারী। তাঁর ভাই বিজনবিহারী জানাচ্ছেন, তাঁদের 'একজন বৈদান্তিক পণ্ডিত শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, আমাদের জ্যাঠামশাই, যিনি বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ করেছিলেন, কালীপ্রসন্নের মহাভারত রচনাকালে যিনি সভাপণ্ডিত ছিলেন এবং যিনি মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম পুস্তকটি সংস্কৃত ভাষায় সঙ্কলন ও সম্পাদনা করেন। আর একজন সংস্কৃত কলেজের সহকারী প্রধান শিক্ষক, নববিধান সমাজভুক্ত, শ্রদ্ধেয় দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনি আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তাঁর জন্ম শতবার্ষিকীতে (১৯৬৪) তাঁর বহু ছাত্র যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছিলেন তার মধ্যে বনবিহারীও ছিলেন। বাল্যকালে মেজদা শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহপাত্র ছিলেন।'

যৌবনে আমাদের মনে প্রতিষ্ঠান-বিরোধী মনোভাব থেকে যে নাস্তিক্যের উদয় হয়, তা চল্লিশে চোখে চালসে পড়ার পর থেকেই ফিকে হতে থাকে। ক্রমশ দেবদ্বিজে ভক্তির উদয় হতে থাকে। যে সব মার্কসবাদীর একটু কিন্তু-কিন্তু ভাব থাকে, তারা ঘুরপথে ভায়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ হয়ে 'মানবিক' পথে ভক্তি-গন্তব্যে পৌঁছন। এই প্রায় অবধারিত পরিণতির মূলে আছে অজ্ঞানতা। আমরা বেদ-উপনিষদ না পড়েই তুনি মেরে ওড়াতে চাই। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও মার্কসবাদের পাতাও ওল্টাই না। তাই নাস্তিক্যের ফাঁকা বুনিয়াদ যৌবনের লুপ্ত তেজের ঠেকনা না পেয়ে সহজেই ধসে পড়ে। বনবিহারীর মতো মানুষদের ক্ষেত্রে তা ঘটে না। কারণ যুক্তির শক্তপোক্ত বুনিয়াদ বা ভিত। বিজনবিহারীর কথাতেই জানতে পারি, 'পনেরো-ষোল বছর বয়সেই মেজদা সংস্কৃতে আদ্য মধ্য ও কাব্যতীর্থ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সংস্কৃত ভাষায় অনেক পদ্য লেখেন। তৎকালীন সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক ও অধ্যাপকদের অতি প্রিয় বনবিহারী স্কুল কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি ইনসটিট্যুটে বহু নাটক অভিনয়ে ও আবৃত্তিতে পুরস্কার পেয়েছিলেন, এ বিষয়ে অন্য ছাত্রদের শিক্ষা দিতেও দেখেছি।... ধর্ম, সমাজ, সভ্যতা ও স্বাধীনতা নিয়ে প্রায়ই আলোচনা করতেন। মনে হয় তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন প্রায় সব পড়া ছিল। আলোচনার সময় তিনি উপনিষদ, গীতা, পাতঞ্জল দর্শন, রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাস, ভবভূতি—সব থেকেই মুখেমুখে এমন উদ্ধৃতি দিয়ে বলতেন যে আশ্চর্য লাগত তাঁর পাণ্ডিত্য দেখে। আবার আমাকে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ট্রিগোনোমেট্রিও পড়িয়েছেন বই না দেখে।' হিন্দু ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, বেদ-পুরাণ পড়েছিলেন বলেই সামাজিক অসুখের মূল কারণটা ধরতে পেরেছিলেন। বিজানবিহারী জানাচ্ছেন, 'হিন্দু ধর্মচর্যার পদ্ধতি, রঘুনন্দনের বিধি বিধান, সামাজিক নির্যাতন এবং বর্বরতার প্রতি তাঁর কোন ক্ষমা ছিল না। এইখানে তাঁকে মনে হত যেন কালাপাহাড়।'

তাঁর কালাপাহাড়ী কাজের কথা আগামী সংখ্যায়।

উ মা

মাদার টেরেজা: মুখ ও মুখোশ
বাংলা অনুবাদ ও সম্পাদনা:
রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়, অমৃতশরণ প্রকাশন,
দূরভাষ: ২৫২-৪৩১৯ / ৯৮৭৪০৭৫৪৯৬
পাওয়া যাচ্ছে কলেজ স্ট্রীটে কফি হাউসের তিনতলায় 'বইচিত্র'-এ।

চিঠিপত্র

মাননীয় সম্পাদক/ উৎস মানুষ,
মহাশয়,

উৎস মানুষ আবার নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে, এটা অত্যন্ত আনন্দের। জুলাই-সেপ্টেম্বর '১১ সংখ্যা হাতে পেলাম। অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণের পর সম্পাদক হিসাবে কোনও নাম উল্লেখ থাকতো না। এই সংখ্যায় আমরা পেলাম উৎস মানুষের নতুন সম্পাদককে—সমীর কুমার ঘোষ। সঙ্গে কয়েকজনের পরিচালকমণ্ডলী। এবার থেকে পত্রিকা আগের মতোই প্রকাশিত হবে ধরে নিতে পারি। তবে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামটি 'সম্পাদনা' হিসাবে উল্লেখ থাকতো। এই সংখ্যায় সেটি সরাসরি সম্পাদক, সম্পাদনা নয়। তবে অশোকদা যখন সম্পাদনা করতেন তখন প্রথম পাতায় থাকতো সম্পাদকীয়। পরবর্তীকালে সেই লেখা হয়েছে 'আমাদের কথা'। আলোচ্য সংখ্যায় সম্পাদক থাকলেও আছে 'আমাদের কথা' (সম্পাদকীয়র বদলে)।

আলোচ্য সংখ্যায় শেষ পাতায় ডাঃ ইন্দ্রশেখর রায়ের 'মাদার টেরেসা' প্রসঙ্গে একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছে। দীর্ঘদিন উৎস মানুষ পত্রিকার সাথে সম্পর্ক। এই পত্রিকা পড়ে অনেক কিছু জেনেছি। তত্ত্ব ও তথ্যের বাইরে গিয়ে যুক্তি নির্ভর রচনা এই পত্রিকার সম্বল। এই পত্রিকা পড়ে ঋদ্ধ হয়েছি অকপটে এই কথা বলতে পারি। এই পত্রিকায় আমার নজরে কখনই এমন লেখা আসেনি যেটি বিজ্ঞানমুখী গণ আন্দোলনের পরিপন্থী। কিন্তু আমার মনে হয়েছে ডাঃ রায়ের এই লেখা (যেটি অন্যত্র প্রকাশিত) নিঃসন্দেহে মরণোত্তর চক্ষুদান আন্দোলনে প্রশ্ন চিহ্ন তুলবে। বাঙালির আবেগে নোবেল জয়ী মাদার টেরেসা অনেকের কাছেই শ্রদ্ধার মানুষ। এছাড়া এক বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের তিনি প্রচারক। ধর্মীয় প্রবক্তাদের বাণী/কথা সমাজে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। আমি মনে করি এই লেখা অনেক সাধারণ মানুষকে চোখ দানে পিছিয়ে আসতে বাধ্য করবে। মাদার টেরেসা প্রয়াত। অন্য কোনও পত্রিকার নেতিবাচক রচনা প্রকাশ করে উৎস মানুষ কি তুলে ধরতে চাইছে বোঝা যায় না। নব নির্বাচিত সম্পাদককে একটু ভেবে দেখতে বলি।

ধন্যবাদান্তে
সীতাংশুকুমার ভাদুড়ী।

সংগঠন সংবাদ

হরিণঘাটায় রাধানাথ চর্চা

(দ্বারকানাথ) কোটনিস স্মৃতিরক্ষা কমিটি আয়োজিত রাধানাথ সিকদারকে নিয়ে আলোচনা সভা হয়ে গেল গত ২৯.৯.২০১১-তে হরিণঘাটায়। উৎস মানুষে প্রকাশিত রাধানাথ সিকদারকে নিয়ে দুটি প্রবন্ধ ও আশীষ লাহিড়ী লেখা রাধানাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী-কে কেন্দ্র করে পুরো আলোচনাটি চলে। স্থানীয় মানুষ প্রবল উৎসাহে আলোচনা সভায় অংশ নেন ও এ ধরনের অনুষ্ঠান আরও বড় করে আয়োজন করার দাবি তোলেন।

নিরঞ্জন বিশ্বাস।

গ্রাহক চাঁদা সডাক ৬০.০০ টাকা

চাঁদা পাঠাবেন কীভাবে—

United Bank of India, College Street Branch, Kolkata- 7000073
Utsa Manush
SB Account no. 0083010748838

এই অ্যাকাউন্ট নম্বরে আপনারা চেক অথবা টাকা জমা দিয়ে দেবেন এবং ফোন করে কিংবা মেল করে আপনার নাম ঠিকানা আমাদের জানিয়ে দিলেই আপনাকে গ্রাহক করে নেওয়া হবে। চিঠি লিখেও জানাতে পারেন। কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হবেন তা জানাতে অবশ্যই ভুলবেন না। যোগাযোগের ঠিকানা, মেল আই-ডি, ফোন নং সব কিছু পত্রিকাতেই পেয়ে যাবেন। **উ মা**

উৎস মানুষ WB/EC 228 ISSN 0971-5800 R.N. 37275/80 Rs. 15.00

৩১ বর্ষ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১১ ১৫ টাকা

পুস্তক তালিকা

১. বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (১) সংকলন	৩৫.০০	৯. আয়ুর্বেদে বিজ্ঞান, সংকলন	৫০.০০
২. যে গল্পের শেষ নেই দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৪০.০০	১০. আরজ আলী মাতুব্বর ভবানীপ্রসাদ সাহু	২০.০০
৩. বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ (৫ম প্রকাশ) সংকলন	৪২.০০	১১. প্রতিরোধ: অন্ধতা ও অযুক্তির বিরুদ্ধে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত (৩য়)	৬০.০০
৪. প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত	৩০.০০	১২. বিবেকানন্দ অন্য চোখে/ সমীক্ষা ও আরো কিছু বিতর্ক	১০০.০০
৫. তিন অবহেলিত জ্যোতিষ্ক (১ম) রণতোষ চক্রবর্তী	১৮.০০	১৩. শেকলভাঙা সংস্কৃতি	৬০.০০
৬. বাংলা বন্‌ধ বা শেষের শুরু হিমানীশ গোস্বামী	৪০.০০	*১৪. ছেচল্লিশের দাঙ্গা : সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়	৯০.০০
৭. এটা কী ওটা কেন, সংকলন	৫০.০০	*১৫. খাবার নিয়ে ভাবার আছে	৪০.০০
৮. 'আমরা জমি দেই নি, দেব না'	১০.০০	*১৬. সাপ নিয়ে কিংবদন্তী	৩৫.০০

*** পরিবেশক র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন**

উৎস মানুষ-এর প্রাপ্তিস্থান

বই-চিত্র (কফিহাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুক মার্ক, অমর কোলে (বিবাদি বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙ্গা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়)। র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রীট), ডি আর সি এস সি ঢাকুরিয়া অফিস (দক্ষিণাপন-এর উল্টোদিকে)। অম্লান দত্ত বুক স্টোর, বিধাননগর পৌরসভা—এফ ডি ৪১৫/এ। দে বুক স্টোর, কলেজ স্ট্রীট

উৎস মানুষ সোসাইটি'র পক্ষে বরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক কলকাতা-৭০০০৬৪ থেকে প্রকাশিত এবং শান্তি মুদ্রণ ৩২/৩, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, দূরভাষ-৯৪৩৩০৯৯৯৩১ হইতে মুদ্রিত। বাঁধাই- নিবারণ সাহা।